এম, এন, হোসেন, বি, এস্‌সি।

১৯২৪

মূল্য বার আনা

চুঁচুড়া,

সান্‌রাইজ প্রেসে,

শ্রীভগবতীচরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমার বেদনাক্লিষ্ট ব্যর্থজীবনের
'পিয়াসা'র সহিত চাচাজান
মুন্সি ; মনজুর আলি
সাহেবের স্মৃতি
জড়িত হয়ে
থাকুক।

দু' একটী কথা
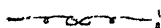
আজ যে এমন ভাবে নিজকে প্রচার করতে দাঁড়িয়েছি, প্রথম চেষ্টার সবটুকু ত্রুটী নিয়ে, সে কেবল তোমরা যে অপমানের বোঝা জোর করে মাথায় আমার চাপিয়ে দিচ্ছিলে, সেটা ফেলে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াবার জন্য। জানিনা ভিতরে বাইরে সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছি কি না! বাঙ্গালী তোমরা বিচার করো।

বইখানির বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ একটী মাসিক পত্র প্রচারের জন্য ব্যয়িত হইবে।

প্রকাশক শ্রীযুক্তভগবতীচরণ পাল মহাশয়ের নিকট আমি অনেকখানি কৃতজ্ঞ।

বড়বাজার, চুঁচুড়া,
১লা আগষ্ট ১৯২৪।

এম, এন্, হোসেন।

সূচীপত্র

পিয়াসা ।

শিলঙের পথে ।

প্রিয় স—

সেদিন যখন সবাই তোমরা এক এক ক'রে চলে গেলে তখন শূন্য বোর্ডিং ঘরখানা যে আমার চোখে কেমন দেখাচ্ছিল তা না বল্লেও বুঝতে পার। আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই কাউকে নিকটে পাবার আশা করছিলুম, সময়টা কাটি'য়ে দিবার জন্য। কেউ যে না এসেছিল এমনও নয়। কিন্তু মানুষের অনন্ত পিপাসার নিবৃত্তি কোথায় ?

পিয়াসা

রাত্রি তখন ৮টা যখন আমি আঁধারের মাঝে আলো নিবিয়ে ভাগীরথীর বুকে একটা ক্ষুদ্র পানসীতে ভাসছি। আকাশে তখন মেঘ, কিন্তু তা ভেবে দেখবার অবসর পাইনি। বৈদ্যুতিক আলোগুলি আর নির্লজ্জ গোটা কয়েক তারা মাত্র আমাদের দিকে হাঁ ক'রে চে'য়েছিল। আমরাও যে দৃষ্টি বিনিময় না ক'রেছিলুম এমন নয়, কিন্তু জোর ক'রে চাইতে পারিনি, কারণ কি জান?

ঢাকা মেল রাত্রি ১১টাতে আসবে। কাজেই এ দু'তিন ঘণ্টা অপেক্ষা না ক'রে উপায় কি? ষ্টেশন প্লাটফরমে জিনিষপত্র নামিয়ে রে'খে, তারই উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লুম। তখনও টিকিট কাটিনি। তখনও জানিনা ঠিক কোথায় যাচ্ছি। একবার ভাবছিলুম, গোয়ালন্দ হ'য়ে জগন্নাথগঞ্জের

ষ্টীমার ধর্‌বো ; পর মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল না চাঁদপুর হ'য়ে আসামের বুকের ভিতর দিয়ে যাব, আবার কে যেন ভিতর হতে আমায় বিপথে টেনে নিয়ে যে'তে চাচ্ছিল। কিন্তু যখন ঢাকার টিকিট কাট্‌লুম, যা' করে সে হল্‌দে রঙ্গের টিকিট হাতে নিলুম, শুধু রঙ্গের জন্য নয়, তা আজ তোমায় লেখবার অবসর আমার নেই, ইচ্ছা আমার নেই, মনের বলও আমার নেই।

অনেক প্রতীক্ষার পর গাড়ী এলো। যে কামরাটাতে উঠ্‌লুম, তাতে সবাই লম্বা হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। যদিও লোক বেশী নাই তবুও যে ভাবে তা'রা স্থানাধিকার ক'রে র'য়েছে তাতে প্রথমে একটু অসুবিধাতেই পড়েছিলুম। কিন্তু জোর ভাগ্য আমাদের বল্‌তে হবে, কাঁচড়াপাড়া এসে ট্রেণ যখন দাঁড়ালো তখন

তিনজন ভদ্রলোক নেমে গেলেন। একটা গোটা বেঞ্চ একদম খালি হ'য়ে গেল। গাড়ী গোয়ালন্দ এসে দাঁড়াবে সকাল বেলায়। কাজেই বিছানাটা খুলে ফেল্লুম। শুলুম। এক বেঞ্চে দুজন শু'য়েছি। ঘুম যে এসেছিল তা ঠিক বল্‌তে পারিনা, আসেনি তাও জোর করে বল্‌তে পারিনা। মেল গাড়ীখানা সহানুভূতি শূন্য ভাবে ছুটে চলেছে, কে লক্ষ্য করেছে কোথায় থামলো না থামলো। আমি সাম্‌নে দেখ্‌ছিলুম শুধু আমার বর্ত্তমান। অতীত খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ভবিষ্যৎ ভাবতে ভয় হচ্ছিল। আমি বাস্তব, জীবন্ত প্রকৃতিকে বুকের উপর টেনে নিয়ে আর সব ভুলে গিয়েছিলুম। সন্ন্যাস আমার ধর্ম্ম নয়।

যখন ঢাকা মেল ষ্টীমারে এসে চড়্‌লুম, তখন সকালের সূর্য্য লাল হ'য়ে গঙ্গাবুক

ছাড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু কি সে ভিড়! তেমন ভাবে ষ্টীমারে যাওয়া অসম্ভব দেখে বাবুর খোঁজে বেরুলুম। টিকিট বদ্‌লে নিলুম। ষ্টীমার প্রায় ১টার সময় নারাণগঞ্জ আস্‌বে। কিছু খাওয়ার নিতান্ত আবশ্যকতা বোধ কর্‌ছিলুম। মুখ হাত ধুয়ে চায়ের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, যদিও আমি চায়ে অভ্যস্ত নই, তবুও সেখানকার তাই নাকি সভ্যতা, অন্য কিছু খাওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ। যখন পেট ঠাণ্ডা হলো, তখন আমার সবখানি মন কে যেন কেড়ে নিয়ে প্রশস্ত, আলোড়িত গঙ্গাবক্ষের উপর ফেলে দিয়েছে। তা কুড়িয়ে নিবার বৃথা চেষ্টা, হারিয়ে ফেলবারি ভয়েই অস্থির। আমি আপনা হারিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়ে শুধু হাঁ করে তারই পানে চেয়ে রইলুম। যখন আমার চমক ভাঙ্গলো,

তখন দেখি হাস্যময়ী সৌন্দর্য্যরাণী সাজিয়া, নারাণগঞ্জ তার নীল আঁচল ছড়িয়ে আমাদের দিকে চে'য়ে র'য়েছে। যারা কাঙ্গাল, তা'রা এ চাউনিতে বিহ্বল না হ'য়ে থাক্তে পারে কি ?

যখন ঢাকার ট্রেণখানাতে আমাদের পূর্ব্ববদেশবাসী বন্ধুদের সহিত বসতে যাচ্ছি, তখন ঢাকার বর্ত্তমান নবাব তাঁর লক্ষ্ণৌ বিহার হ'তে ফিরবার পথে সেই ট্রেণেই এসে চ'ড়ে বস্‌লেন। সঙ্গে কতকগুলো যে বিভিন্ন রকমের বেশভূষাধারী মোসাহেব ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাদের আদবকায়দা, ভাবভঙ্গী অনুকরণের জিনিষ না হ'লেও সে যে দেখবার জিনিষ সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ করবার কিছু নাই। এ দেশের সবই অদ্ভুত। ট্রেণখানার সে কি বিশ্রী শব্দ !

নারাণগঞ্জ হ'তে ঢাকা মাত্র ১০মাইল। তারই মাঝে আবার তিনটে ষ্টেশন আছে। যেতে ৪০ মিনিট লাগে। আমি অবাক হ'য়ে ঢাকাই কথা শুনছিলুম এতক্ষণ। কিন্তু যখন ঢাকা ষ্টেশনে এসে গাড়ীখানা দাঁড়ালো, আর আমি গাড়ী হ'তে জিনিষপত্র নিয়ে নেমে এলুম, কলের পুতুলের মত একটা অপরিচিত সহরের মাঝে, আমার তখনকার মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করবে কি? আমি যাঁর অতিথি হ'ব ভেবে ঢাকা এসেছিলুম, তিনি বা তাঁর কেউ উপস্থিত নাই, আমিও কিছুই চিনি না; তখন আবার একটি হিন্দু ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন 'আপনি কোথায় যাবেন?' তাঁর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উপযুক্ত শাস্তিই আমি তাঁকে দিয়েছিলুম। ঢাকায় ৪০ ঘণ্টা থাকা কালীন আমি তাঁরই ঘাড়ে অতিথিরূপে চেপেছিলুম।

তিনি যত্নেরও ত্রুটি করেন নি' এবং আমি স্বীকার না ক'রে থাকৃতে পারি না যে, তাঁর স্ত্রীর উদারতা ও আতিথ্য আমি এ জীবনে বিস্মৃত হ'তে পারবো না। হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমান অতিথি খুব কমই হ'য়ে থাকে, কিন্তু আজ যা দেখলুম, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

১৩ই মে রবিবার বিকালে ঢাকা সহরটা বেড়িয়ে দেখবার প্রলোভন সম্বরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। বেড়ালুম। সহরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ঢাকার নূতন পুরাতন স্কুল কলেজগুলো দেখলুম, নূতন ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংটা একটু খুটি নাটি করে দেখলুম, নবাব বাড়ীগুলো দেখলুম, বাজারে ঘুরলুম, আর দেখলুম বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে সারি সারি ভাউলে।

১৪ই 'মে সোমবার সকালে ঢাকা Agricultural Laboratory দেখতে গিয়েছিলুম। সে আবার ঢাকা হ'তে ৪ মাইল ট্রেণে চড়ে যেতে হয়। তেজগাঁ ষ্টেশনে গিয়ে সকালে নামলুম। সেখান হতে Laboratory প্রায় ১ মাইল। যাঁরা সেখানে কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে অল্পায়াসেই আলাপ হ'লো। তখন তাঁরা সকলেই নিজ নিজ বিভাগীয় জিনিষগুলির অল্পবিস্তর বর্ণনা আরম্ভ করলেন। একজন উদ্ভিদ্ জগতের বিভিন্ন ব্যাধির বিষয় এমনি গবেষণাপূর্ণ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন, ও অন্যজন এত অদ্ভুত প্রকারের শস্যকীট এনে আমার চো'খের সামনে হাজির করে তাঁর microscopeএর নীচে ধরলেন, যে আমি যেন দশ বছরের ছোট হ'য়ে, মনে হচ্ছিল, আবার সেই আমার

খ

পিয়াসা

ছাত্র-জীবনের বিজ্ঞানাগারের মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যোগ দিয়েছি। সদাই মনে হচ্ছিল, জীবনটাকে কি ক'রেছি আমি। যখন আমার ভারি মনখানা নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম, তখন বেলা প্রায় ১১টা। তারপর যে কয় ঘণ্টা ঢাকায় ছিলুম সে মোটেই ভাল লাগেনি। একটা গভীর আত্মগ্লানি আমার সমস্ত মন প্রাণটাকে এমনি করে ছেয়ে ফেলেছিল, যে সদাই মনে হচ্ছিল কতক্ষণে এসব ভুলে যাব আবার। তখন ট্রেণ ছিল না। পরদিন সকাল ৭টায় ট্রেণ। আমার অন্তর্যামী জানেন, কেমন করে বাকি ক' ঘণ্টা কাটিয়েছিলুম। পরদিন যখন গৌহাটীর টিকিট কিনে ট্রেণে এসে বসলুম তখন কেবল একটি হিন্দু গৃহিণীর মাতৃভাব ও আমার হঠকারিতার বিষয় ভাবতে ভাবতে আমার

নির্জ্জন কম্পার্টমেণ্টে ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দেখি, লোকগুলো ময়মনসিং ষ্টেশনে ছুটাছুটি ক'রছে। বেলা তখন ১২টা। সোরাবজীর হোটেলে যা খেলুম তাতে দুটো টাকা জলে ফেল্লুম বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু অন্য উপায় ত তখন ছিল না। সেখান হ'তে বাহাদুরাবাদে তার দিলুম যে, ষ্টীমারে যেন আমার 'ডিনার' প্রস্তুত থাকে।

বিকালের সূর্য্য আকাশের গায়ে ঢ'লে পড়েছে। সন্ধ্যা হ'তে আর বড় বেশী দেরী নাই। যমুনাবক্ষে E. B. Ry.এর প্রকাণ্ড ষ্টীমারটা হেলতে দুলতে ভেসে চলেছে। বাহাদুরাবাদ হ'তে তিস্তামুখঘাট ৪৫ মিনিটের পথ। মানুষ যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্রষ্টার অপার মহিমা দেখতে চায়, তবে সে আজ এসে, এই আমাদের

পাশে, ফার্ষ্ট ক্লাস ডেকে একখানি আরাম কেদারা নিয়ে বসুক। বুঝতে পারবে, আমরা কি, কোথায় চলেছি! প্রশস্ত নদীবক্ষে জল আকাশের সঙ্গে মিশে খেলা ক'র্‌ছে। বাতাস অদ্ভুত এক মাধুরী মাখা। নীল আকাশের গায়ে, অনেক উঁচুতে কি কতকগুলো পাখী উড়্‌ছিল। দূরে আরও দু' একখানা ষ্টীমার ধোঁয়া উড়িয়ে আস্‌ছিল কি চ'লে যাচ্ছিল। আর ছেলেগুলো নদীতীরে আমাদের ষ্টীমার খানাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। ষ্টীমার এসে দাঁড়াতেই রাজ্যের ছেলের পাল এ'সে ডেক ছেয়ে ফেল্লে। আমরা 'ডিনারে' বসলুম। ট্রেণ ৭টায়।

আসাম মেলের একটী সুন্দর কক্ষে, যাত্রী মাত্র আমরা দু'জন। অন্যজন রেল ষ্টেশনের খাবার পরিদর্শক। কথা বলবার জন্য কেউ

নেই বলেই;" ইতিমধ্যে আমাদের আলাপ হ'য়েছে। তিনি আমিনাবাদ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই থাক্‌বেন। যখন গোলকগঞ্জে এলুম, তখন পরস্পরের মুখখানা ভাল ক'রে দেখে নিলুম। সকালের নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলো ট্রেণ কম্পার্টমেণ্টে সমাধা করতে কোন অসুবিধাই হয়নি। ইচ্ছা করলে স্নান পর্য্যন্তও ক'রতে পারতুম। চৌবাচ্চা জলে তখনই পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল। আর জলটাও বেশ পরিষ্কার।

আসাম মেল অবিরাম ছুটে চ'লেছে। যেন এদেশে দাঁড়াবার মত ষ্টেশন নাই। রাস্তার উভয় পার্শ্বে গভীর জঙ্গল। আবার কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, বুকে তার মেঘরাশি নিয়ে খেলা ক'রছে। দূরে, অনেক দূরে এক আধটা কুটীর দৃষ্ট হয়। আর আমরা তারই

দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছি। যখন রঙ্গিয়া জংসনে ট্রেণখানা এসে দাঁড়ালো, তখন বেলা প্রায় ১১টা। উত্তরে স্পষ্ট তখন শৈলরাজ হিমালয় আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সে কি বিরাট, কি মহান দৃশ্য!

ব্রহ্মপুত্রকে দেখে ট্রেণখানা যখন ভয়ে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়ালো তখন জীবনে আর একটা নূতন দৃশ্য দেখলুম মনে ক'রে, কেমন একটা আনন্দই বোধ করেছিলুম। E. B. Ry. Steamer এ চড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার দিকেই শুধু চেয়ে রয়েছি। হঠাৎ খানসামা এসে 'ব্রেক-ফাষ্টের' খবর দিতেই চমকে উঠলুম। প্রথমটা খাবনাই ঠিক করেছিলুম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই জ্ঞান হলো, তখন না খেলে আর রাত্রি ৮টার আগে, শিলঙ না পৌঁছান পর্য্যন্ত ভাগ্যে

কিছু জুটবে না। আস্তে আস্তে টেবিলের ধারে উঠে গেলুম।

পাণ্ডু ষ্টেশনে কিছু ব্যয় সংক্ষেপের জন্য যে শ্রেণীর মোটারে চ'ড়েছিলুম, তা এ জীবনে অপরের অজ্ঞাত থাকাই ভাল। মোটার ভাল হোক, মন্দ হোক, ছুটেছে। পাণ্ডু হ'তে শিলঙ ৬৮ মাইল। এই ৬৮ মাইল অবিরত ভীষণ অরণ্য সমাকীর্ণ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। সে এক ভীতিপ্রদ দৃশ্য। একটা পাহাড় অপরটাকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তারপর আর একটা তাদের হার মানিয়েছে। এ একটা গোটা জিনিষের মধ্যে যেন ঢেউ'র রাশি। আমিত মনে করলুম এ পাহাড়ের মহাসমুদ্র। ঢেউগুলোই ঐ শৃঙ্গাকারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার গায়ে, যে এমন ক'রে কত বছরের চেষ্টায় এমন সুন্দর একটা

পথ নির্ম্মাণ করেছে, অবশ্যই তাকে আজ প্রাণভরে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারি না।

পথ কোথাও উঠেছে, কোথাও নেমেছে। এত হঠাৎ উঠা নামাগুলো এসে একের পর এক ক'রে হাজির হয় যে, দেখে ভয়ই করে। পথ এত সঙ্কীর্ণ যে কোথাও কোথাও দুপাশের গাছ পালাতে আমাদের গা ঘোসে যাচ্ছিল। পথের ধারে একস্থানে চা খাবার বন্দোবস্ত আছে। ঠিক মনে নাই বোধ হয় দু'টো পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিসও আছে। এরই একটার নাম 'নংপো'। মোটার এসে অফিসের নীচেই দাঁড়ালো। মনে করলুম, যেখানে যাচ্ছি তাঁদের একটা খবর দিয়ে রাখি। তার করলম, "Coming this evening"

সেদিন আঁধারের মাঝে শিলঙ এসে যখন পড়লুম তখন যে তার পাহাড়গুলোর বিষয়,

তার ঘর বাড়ীর বিষয় একটা ঠিক কিছু ধারণা করতে পেরেছিলুম তা বলে মনে হয় না। চোখের সামনে চারিপাশে যেন একটা জমাট আঁধারের রাজ্যে এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছিল। তার ভিতর কিছু খুঁজে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু কে যেন আমায় চিরপরিচিতের মত এসে খুঁজে নিলে। আমি আঁধারে আলো দেখতে পেলুম।

শিলঙ 'কাউন্সিল হাউসের' পাশেই বৈদ্যুতিক আলোশোভিত একটা বাড়ীতে এসে যখন উঠলুম তখন মনে হলো বুঝি আমার এখানকার দিন কটা একটু শান্তিতেই কাটাতে পারবো।

সে কি অদ্ভুত লোভ! হারান জিনিষ হঠাৎ পড়ে পেলে এমনি বুঝি হয়ে থাকে। প্রকাণ্ড বাড়ীটার একটা কামরার দিকে কে

গ

আমায় ইঙ্গিতে টেনে নিয়ে এলো। ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে যা দেখলুম তাতে চম্‌কে দরজার কাছে থম্‌কে না দাঁড়িয়ে পারলুম না।

দেখি, বড়মানুষী কায়দায় যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে সাজান রয়েছে। আর তারই মাঝে ১৩ বছরের 'সেরিফ' তার কোঁকড়া চুলের রাশিতে বিমল মুখখানিকে অর্দ্ধেকটা ঢেকে বাকিটার উপর বিজলী বাতির সবটুকু আলো এমনি ভাবে ফেলে বসে আছে যে, তেমন আলো-ছায়ার মাধুর্য্য আমার জীবনে আর একবার মাত্র পূর্ব্বে দেখেছিলুম বলে মনে হয় ৷ সে থিয়েটারে। মিনার্ভার তখন বেজায় নাম ডাক।

আমি তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে হতে কে ডাক্‌লে 'সেরিফ!' ধ্যান যেন তার ভঙ্গ হলো, খেলা যেন তার সাঙ্গ হলো।

সে শিস্ দিতে দিতে কোন দিকে না চেয়েই ঘরের বার হয়ে গেল। কিন্তু এসেন্সের তার তীব্র গন্ধ ঘরে আরো জোরে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেল। আমার ক্লান্ত দেহখানি নিয়ে চুপটী করে বিছানায় আশ্রয় নিলুম। আজ চার পাঁচ দিন ট্রেণ, ষ্টীমার ও মোটারের হাঙ্গামার পর মনে হচ্ছিল এইবার বুঝি মুক্তি পেলুম। মিছে আশা! আজ আর আমি একা নই। এখন সেরিফই আমার 'room-mate,' খেলার সাথী, বেড়াবার সঙ্গী ও পথ-প্রদর্শক। সে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ঘুড়ির প্যাঁচ খেলা তার একটা মস্ত 'হবি'। দিন এজন্য তাকে চার পাঁচখানি ঘুড়ি তৈরী করতে আমার সাহায্য অনেক সময় নিতে হয়। আর পড়াশুনা, তাতে সে 'Hall Caine' এর 'Prodigal son'.

এই সাংসারিক প্রাচুর্য্যের মধ্যে শিলঙের আব্‌হাওয়া যা তাকে গড়ে তুলছে, তাতে যদি সে নিজেকে হারিয়ে না বসে, তবে সে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বল্‌তে হবে। আমি অনেক সময় 'The Woman Thou Gavest Me' পড়তে পড়তে, তার ভাসা ভাসা চোখের দিকে চেয়ে, তার গলার গান দিয়ে তাকে বুঝবার চেষ্টা কর্‌তুম। মনটা শিউরে উঠতো! প্রাণটা আমার কাঁদ্‌তো!

শিলঙে আজ আমার প্রথম বিকাল। অনেক আগে হতেই কোন্‌দিকে বেরুব তার প্রোগ্রাম ঠিক করছিলুম। জানিনা কাকেও, চিনিনা কিছুই। কাজেই এ বিষয়ে আমায় বড় একটা বেগ পেতে হয়নি। সেরিফ নিজেই তার পথ ঠিক করে নিয়ে আমায় জোর গলায় বুঝিয়ে রাজি করে নিল। আমি অন্ধের মত

তার কাঁধে হাত রেখে চল্লুম মাত্র। লাল আঁকা বাঁকা পথের উপর দিয়ে উঠা নামা করতে করতে চলেছি। দুই পাশে ঝাউ, পাইন ও ইউকেলিপ্টাসের জঙ্গল। গাছগুলো কি সোজা হয়েই উঠেছে! তাদের কারুর মধ্যে যেন সদ্ভাব নেই। সবাই আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কারুর গায়ে ঢলে পড়েনি। কিন্তু লতাগুলো তাদের জড়িয়ে ধরে বেশ ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। পথের দুধারে মনে হয় যেন ফুলের মেলা কেউ আজ যতন করে বসিয়েছে। গন্ধে তার প্রজাপতি, ভোমরা, আর ছেলে মেয়েদের কি স্ফূর্ত্তি!

পাহাড় প্রাচীর ঘেরা 'স্প্রেড ঈগল প্রপাতের' ঝর্ ঝর্ শব্দ দূর হ'তে শুন্তে শুন্তে তার মুখের কাছে এসে দাঁড়ালুম।

তখন সন্ধ্যার আঁধার নেমে আস্‌ছে। চারিদিকে গভীর বনভূমি। পা বাড়াতে বুক কেঁপে উঠছে। কিন্তু ধন্য তাদের সাহস, ধন্য তাদের বিশ্বাস। আমায় বাধ্য হয়ে সেই সময়ে, সেইস্থানে বস্‌তে হ'লো। দেখলুম, গোধূলির গোলাপী আভায় প্রপাতের রঙ করা জল প্রায় ৫০ ফিট উপর হ'তে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে গোলমাল করে ছুটে চলেছে। কি উদ্দাম, উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল সে বেগ! এ যেন এই স্বর্গের রাজ্যেরই জিনিষ— আমাদের পৃথিবীর সীমার বাইরে। এই জন্যই কি হিমালয় দুহিতাকে স্বর্গ হতে নেমে এসেছেন বলা হয়? পলকহীন চোখে শুধু চেয়ে রয়েছি। ছেড়ে যেতে মন সর্‌ছিল না। তবুও যখন একটা হুকুম মেনে বাড়ী মুখে ফির্‌লুম, তখন আবার আস্‌বো বলে ঠিক করেই ফির্‌লুম।

তারপর কতবার গিয়েছি সেখানে, তবু দেখবার সাধ মেটেনি। একদিন 'ব্যোমের' অদ্ভুত খেয়াল চাপলো সে ওটার মাথায় চড়ে দাঁড়াবে, আর সেই অবস্থায় তার একখানা 'ফটো' নিতে হবে। বাঙ্গালীর ছেলের এই গিরি লঙ্ঘনের সাধ, বিশেষতঃ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে, কম সাহসের বিষয় নয়। আমরা কতকদূর উঠেছিলুম সত্য, কিন্তু যতদূর আশা করেছিলুম তার কিছুই হয়নি, আর সেদিন সহসা আঁধার এমনি ঘনিয়ে এলো যে 'ফটো' নেওয়াও অসমাপ্ত রয়ে গেল। সাধ পূর্ণ হয় ক'জনের?

ব্যোমের বাবা এখানকার 'ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়ার'। সে ছুটীর গরম দিন কটা এই শৈলবিহারে কাটাবার জন্য এসেছে, সারা পথ ভেঙ্গে 'চিনসুরা' হ'তে। এই সুদূর প্রবাসে

পিয়াসা

যেদিন তার দেখা পেলুম, সেদিন বেশ একটু আশ্বস্তিই বোধ করেছিলুম। তারপর হতে সে প্রায়ই বিকালে তার মোটারখানা নিয়ে আমার কাছে আস্‌তো। সেদিন তারই মোটারে 'বিডন' ও 'বিশপ' প্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম। তারা যেন দুটী বোন গলাগলি হয়ে স্বর্গ হতে হট্টগোল কর্‌তে কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে—শিলঙকে তাদের পূত ধারায় ভাসাবার জন্য, তাদের অন্তর্নিহিত আলোকে উদ্ভাসিত কর্‌বার জন্য। তাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্র এখন শিলঙের তীর্থস্থান।

'এলিফ্যানটা প্রপাত' শিলঙের বাইরে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এইটাই এখানকার সকল প্রপাত হ'তে বড়। দিন আর তখন নাই বল্লেই হয় যখন ব্যোমের সঙ্গে সেখানে এসে পৌঁছালুম। যা দেখলুম তাতে

নূতনত্বের মাধুর্য্যের ভিতর হতে যেন নিঝুম আঁধারের বিভীষিকা ফুটে বেরুচ্ছিল। আনন্দের ভিতর এতখানি ভয় আর বোধহয় কোথাও কখনো বোধ করিনি। এতখানি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, সম্পদ ও বিপদের কোমল-কঠোর সমাবেশ, ভূপৃষ্ঠে বিরল না হলেও, বড় একটা সহজে চোখে পড়ে না। তাই যারা কাণে কাণে কথা বল্‌তে ভালবাসে, তাদের জন্য সকল আয়োজন কে আগে হতেই এখানে করে রেখে দিয়েছে। যখন বাড়ীমুখো মোটার আমাদের ধীরে ফিরে আস্‌ছে, আর আমরা শিলঙ পিকের কথাতেই ব্যস্ত আছি, তখন বঙ্গ-বালাদের কোকিল কূজনে আমাদের গতি বন্ধ না করে পার্‌লুম না। তারাই নাকি নগ্ন প্রকৃতির মাধুরী প্রতিমা!

শিলঙের সবাই তাদের বড়বাজারের গল্পটা বড় করেই ক'রে থাকে; কারণও যে একবারেই নাই তা'ও নয়। সপ্তাহে একদিনমাত্র বড়বাজার বসে। আর একদিন সেইখানেই যে বাজার বসে, তাকে তারা ছোটবাজার ব'লে থাকে। কেনাবেচার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে, জনতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সত্যই বড়বাজার একদিনই হ'য়ে থাকে। অদ্ভুত তাদের প্রথা। এ সপ্তাহে বড়বাজার যদি সোমবারে হয়, আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবারে হ'বে, তার পর সপ্তাহে বুধবারে হ'বে। ক্রমেই বড়বাজার ঘুরছে। আর ছোটবাজার বড়বাজারের সঙ্গে দূরত্ব সমান রেখে চলেছে মাত্র। এ যেন গ্রহ উপগ্রহের খেলা। সব হ'তে আমার আশ্চর্য্য ঠেকছে যে, এতবড় বড়বাজারটার ভিতর

একজনও পুরুষ দোকানী নাই। বিভিন্ন বেশভূষায় সজ্জিতা খাসিয়া বালিকা তাম্বুলমাখা মিষ্টি কথায় যে ভাবে কেনাবেচা কর্‌ছে, তা' দেখলে মোগল ইতিহাসের 'নৌরজ' উৎসবের কথা মনে পড়ে, আর মনে আসে সভ্যতাভিমানীদের 'ফ্যান্সি-ফেয়ার'। ব্যবসা ক্ষেত্রে খাসিয়া বালিকা যে চাতুর্য্য ও দক্ষতার পরিচয় দি'য়ে থাকে, তা খাসিয়া যুবকদিগের ভিতর বিরল। তাই পুরুষগুলো ভারবাহী পশুর মত সদা বোঝা টেনেই বেড়ায়, কিম্বা অলস মাছির মত শুধু ব'সে ব'সে খায়। খাসিয়া মহলে এই কারণেই স্ত্রীজাতির আসন উচ্চে। বিলেতী ধর্ম্ম ও বিলেতী সভ্যতা যে ভাবে তাদের ভিতর ছ'ড়িয়ে প'ড়ছে তাতে যে তার আনুসঙ্গিক সংক্রামক ব্যাধিগুলোও তাদিকে জড়িয়ে ধ'রছেনা তা কে বলবে?

অনেক সময় তাদের সরল-মধুর ভাব দেখে আমরা চেয়ে রই সত্য, কিন্তু, যে মাধুর্য্য হ'তে মোহের সৃষ্টি তা যে এ পাহাড়িয়াদের শরীরে আছে, সে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। কোনও ঔপন্যাসিকের লেখনীপ্রসূত ছবির অনুরূপ কিছু একটা খুঁজে বে'র ক'রবার চেষ্টা আমার বৃথা হ'য়েছে। সেখানকার লতা-বিতানে পাপিয়া ডাকে না, কুঞ্জবনে দোয়েল গায় না, গোলাপ-ক্ষেতে বুল্ বুল্ উড়ে না, ঝরণার ধারে কারেও শূন্য কলসী কক্ষে দেখা যায় না।

আজ সমস্ত শিলঙময় একটা হুলস্থূল প'ড়ে গ্যাছে—'নঙক্রেঙের নাচ'। নঙক্রেণ শিলঙ হ'তে প্রায় ১২ মাইল বাইরে অবস্থিত। বৎসরে একদিন খাসিয়া কুমারীগণ এইস্থানে রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গনে তাদের অদ্ভুত নৃত্যকলায়

দর্শকচিত্ত বিমোহিত করিয়া থাকে। তাই আজ সকাল হ'তে সমস্ত শিলঙ যেন নঙক্রেণের পথে ছুটেছে। এতে জাতিভেদ নাই। উচ্চ নীচ নাই। খাসিয়া, বাঙ্গালী ও সাহেব, রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসাদার সবাই চ'লেছে। ট্যাক্সি ভাড়া চারগুণ বেড়ে গ্যাছে। কত পাহাড় পর্ব্বত ডিঙিয়ে যখন আমি নঙক্রেণ এসে পৌঁছালুম তখন বেলা প্রায় দুইটা। তার একটু পরেই আসামের গভর্ণর মিঃ কার এসে পৌঁছালেন। খাসিয়ারাজ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য এগিয়ে গেলেন। লোকে যাকে রাজা বলে, যার নিকট মাথা নত ক'রে দেয়, ভগবান কি তাকে এমনি সুন্দরই ক'রে থাকেন? একটা সোণার আভা যেন সমস্ত শরীরময় খেলে বেড়াচ্ছে। এমন নিটোল শরীর বুঝি কবি কল্পনারও অতীত। দে'খলেই

মনে হয়, এ যেন সতেরটা বসন্তের গড়া জিনিষ। কি স্বাধীনতাব্যঞ্জক হাব ভাব! ওগো পাহাড়িয়া—তুমি আমার অন্তরের পূজা গ্রহণ কর।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতিদের ভিতর নাচ দেখেছি। কলিকাতায় ফরাসী, ইংরাজ ও আমেরিকান্ মহিলাদের দেখেছি, ডুম্‌কায় সানতালদের দেখেছি, দিল্লীতে মুসলমান বাইজীদের দেখেছি, কিন্তু খাসিয়া নাচ যে না দেখেছে, সে যে এর বিষয় একটা ঠিক ধারণা ক'রতে পারবে তা মনে হয় না। তারা সবাই বিভিন্ন রঙের রেশমী পোষাকে সেজে, মাথায় সোণা বা রূপার মুকুট প'রে, দু'জন দু'জন ক'রে ছবিটী যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু স্থিরভাবে দে'খলে বুঝতে পারা যায় তাতে প্রাণ আছে, ভাবের প্রাচুর্য্য আছে, গতির ক্ষীণ প্রতিবন্ধকতা

আছে। তাতে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী নাই, লালসার জ্বালাময়ী উদ্দীপনা নাই, বক্র কটাক্ষপাত নাই। ভাষা তাদের নির্ব্বাক্, গান তাদের মূক, দৃষ্টি তাদের স্তব্ধ। ভারত যাদের সতীত্ব গর্ব্বে গৌরবান্বিত, দীপ্ত, তাদের কাছ হ'তে অন্য কিছু আশা করাত' অন্যায়।

মোটার অফিসের সাম্‌নেই মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে 'Shillong to Cherra—one of the finest drives in the world'. সেদিন সকালে আর বেশী কিছু খোঁজখবর না নিয়েই হানিফ, শের, সারা ও সেরিফের সহিত প্রকাণ্ড একটা মোটারে কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লুম। খাসিয়া 'ড্রাইভার' গাড়ী বেশ সতর্কতার সহিত চালাচ্ছিল। 'শেরের' তা সহ্য হ'ল না। সে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কেমন

মোটার চালাতে শিখেছে, তা আমাদের দেখাবার লোভটুকু সম্বরণ করা তা'র পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠলো। এক কথাতেই 'ড্রাইভার' বেচারা হুকুম মেনে স'রে গেল। সে তখন সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথের উপর দিয়ে, পাহাড়ের গা বে'য়ে তার 'reckless driving' আরম্ভ ক'রলে। পাশেই খাদ, গভীর খাদ। তার গভীরতা কোথাও কোথাও ৫০০ ফিটেরও অধিক। নীচে কি আছে তা উপর হ'তে ঠিক বোধ ক'রতেই পারা যায় না। মোটার কোথাও দেড় কি দুই ফিট স্থানচ্যুত হ'লেই আমরা সকলেই যে ধূলিকণায় পর্য্যবসিত হ'ব, সে জ্ঞান যেন তার আদৌ নেই। জীবনের প্রথম মাদকতা এম্‌নি বুঝি উগ্র, এম্‌নি বুঝি তীব্র, এম্‌নি বুঝি উন্মাদনাপূর্ণ।

চেরা শিলঙ হ'তে ৩৬ মাইল। শিলঙ ৫০০০ ফিট উপরে, কিন্তু চেরা তাহ'তেও অনেক বেশী। সে যেন মেঘের রাজ্যের উপরে অবস্থিত। চেরার গা বে'য়ে যেতে আমাদের অনেক সময় মেঘের মধ্য দিয়ে যে'তে হ'চ্ছিল। তখন আমরা এমনি ঢাকা প'ড়ছিলুম, যে গা'য়ে গা দিয়ে ব'সে থা'কলেও কেউ কা'র মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম না। কি স্ফুর্ত্তি! সেরিফের কি চেঁচামেচি! জীবনের সে এক অভিনব অনুভূতি!

পথের মাঝে ঝরণাগুলো, কোথাও শুক্‌নো তাদের মুখ নিয়ে, কোথাও উদ্দাম তাদের হাঁসি নিয়ে, একের পর এক এ'সে প'ড়ছিল। পাহাড়গুলোকে কে যেন একটা অদ্ভুত রঙ্গমঞ্চের মত সাজিয়ে রে'খেছে। সে যেন কল্পনার অতীত কোন স্বপ্ন রাজ্যের ছবি।

পিয়াসা

পথের শেষ সীমায় চেরার সব হ'তে বড় জলপ্রপাতটার কাছে এসে মোটার আমাদের থামলো। দূর হ'তে তার ডাক শুনে বুকে কত আশা নিয়ে ছুটে আসছিলুম, তাকে যখন মেঘের কোলে দেখলুম তখন আমাদের বড় আশায় সত্যই ছাই প'ড়লো বলে মনে হ'য়েছিল। তার চীৎকারে কাণ বধির হ'য়ে যাচ্ছিল, কিন্তু করবার ত কিছুই ছিল না। কতক্ষণ শুধু হাঁ ক'রে শব্দ লক্ষ্য ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম মাত্র। মেঘরাজের আকাঙ্ক্ষার বুঝি তৃপ্তি হ'ল! তিনি একটু স'রে দাঁড়ালেন। সামনে যাকে পে'লুম তা'র উদ্দেশে আমার দুর্ব্বল লেখনীর ক্ষীণ শক্তি নিয়োজিত ক'রবো না। কয়েকটা ছবি নিলুম, কিন্তু দেবরাজের তা সহ্য হ'ল না। সব নষ্ট করে দিলেন।

ক' পা' স'রে গিয়ে শুভ্র একটী, স্বচ্ছ একটী, ক্ষুদ্র একটা তটিনীর তীরে শৈলাসনে বন-ভোজনের আমরা ব্যবস্থা ক'রতে লাগলুম। পাতের খাবার কেড়ে খাওয়া, আর আড় নয়নে তার সুযোগ খুঁজার যে ছবি না ধরেছিলুম এমন নয়, কিন্তু যাঁরা চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টিপাতের বিবরণ জানেন তাঁরা সহজেই স্বীকার ক'রবেন যে সেখানে 'ক্যামেরা' নিয়ে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

চেরার শেষ পাহাড়টার মাথা হ'তে সিলেটের সমতল ভূমি বেশ দেখা যায়। Eye-glass এর ভিতর দিয়ে দেখতে অতি মনোরম। পাহাড়ের শেষ আর সমতল ভূমির আরম্ভ একটা ভৌগলিক বিচিত্র দৃশ্য। আট মাইল পর্য্যন্ত মনে হয়, পাহাড় যেন ক্রমেই নেমে চ'লেছে, বড় তাড়াতাড়ি নেমে চলেছে।

যাদুকরের কাঠি দিয়ে কে যেন হঠাৎ এখানে সবই বদলে দিয়ে গেছে। তবু পাহাড় প্রায়ই গাঝাড়া দিয়ে উঠে।

১৬ই জুন সকাল হতেই ঝিপি ঝিপি বৃষ্টি প'ড়ছিল। তা'রই মাঝে বাড়ীমুখো ফিরলুম। যখন গৌহাটী এসে মোটার দাঁড়াল তখন বৃষ্টি নাই সত্য, কিন্তু আকাশের অবস্থা বড় ভাল বোধ হচ্ছিল না। সেদিন আর কলিকাতা-মেল ধ'রবার সময় ছিল না, কাজেই গৌহাটী ডাকবাঙ্গলোয় উঠলুম। 'সিরাজ' এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। বয়স তার কাঁচা। কাজগুলো তার মিষ্টি। হাঁসিটা তার সৃষ্টিছাড়া।

শিলঙের কথা এখন আমার অতীতের স্মৃতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার অনেক জিনিষই ক্রমে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার সমস্ত

বর্ত্তমান জুড়ে আছে 'সেরিফ' ও 'সিরাজের' কাজগুলো।' আজ আমরা কোথায় !

২৭এ মে, ১৯২৩

মনের ছায়া ঃ

অমিয়! তুমি কি ভাবছো? তোমার মুখ চোখ অমন দেখাচ্ছে কেন? জ্বর আসেনি ত? কা'র অমন মুখ চোখ দেখলে আমার বড় ভয় পায়, চারিদিকে বসন্তের যে প্রাদুর্ভাব!

না জ্বর আসেনি; তবে মাথার বেদনায় অস্থির আছি। মনটা কি করছে। আমার যে কিছুই ভাল লাগছে না। আচ্ছা, মরণ কি করে হয় বলতে পার?

হাঁসালে দেখছি। তোমার মত বয়সে আজকালকার দিনে অনেকেরই ঐরূপ সাধ সময় সময় হ'য়ে থাকে, কিন্তু সত্যই যদি একবার যমরাজ এসে মাথার কাছে দাঁড়ান, তখন কি

কর বলত ? পারশী সাহিত্যে সেই একটা গল্প আছে জান ?

থাক তোমার গল্প। নীহার! তুমি আমায় আজ পর্য্যন্ত দেখে যে পারশী সাহিত্যের গল্পের নায়কের সঙ্গে এক মঞ্চে স্থান দিতে দাঁড়িয়েছ এতেই আমার যথেষ্ট হয়েছে। আজ আর বেশী কথা ব'লনা; প্রকৃতই আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি বোধহয় খবরের কাগজগুলো নিয়মিতভাবে আজকাল আর প'ড়ছনা। আমেরিকাতে আত্মহত্যা করাটা যে কিরূপ একটা তীব্র সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ছে তার কি তুমি কোন খবরই রাখ না ? সমগ্র পাশ্চাত্য জগত যে বিষ সমাজ হ'তে দূর করবার জন্য আজ গভীর গবেষণায় রত তার অস্তিত্বই তুমি অস্বীকার করতে চাচ্ছ—একটা পতিত জাতির অস্পৃশ্য

সাহিত্যের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে। কি হৃদয়হীন তুমি—নীহার! যদি মনটা আমার তোমায় দেখাতে পারতুম, বুঝতে পারতে, কি ঘোর বিতৃষ্ণায় আমার আকণ্ঠ ভ'রে উঠেছে। বল দেখি কি সুখের আশায় আমি ব'সে আছি? কি আমি পাইনি, কি আমি পাব? সামনেত আমার অনন্ত নিরাশা বই আর কিছুই দেখছি না! শাহারার শূন্যতা এই শ্মশানের হাহাকারের মাঝে দিবারাত্রি আমায় কি ভাবে পিশছে, তার তুমি কি বুঝবে। মৃত্যু কি এ হতেও শুষ্ক, এ হতেও জ্বালাময়?

সত্যই বলেছ অমিয়, আমি তোমায় বুঝতে পারলুম না। তোমার সুখ-দুঃখ তোমার হাঁসি-কান্নার ভিতর দিয়ে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাতে যে আমার বিবেক বুদ্ধি অনেক সময়ই লোপ পেয়ে বসে। তোমার

বিচার ভার মাথায় নিবার মত শক্তি আমার নেই। যাকে ভগবান সকল দিক দিয়ে আমার মত দরিদ্র করে সৃষ্টি করেছেন, তার কাছ হতে যদি বেশী কিছু চাও, বেশী কিছু আশা কর; তা'হলে তার ভগবানকে উপহাস করা হয় মাত্র। আজ হঠাৎ মন তোমার এমন হ'ল কেন? এই ত খেলে এলে! খুব ত ছুটছিলে, খুব ত হাঁসছিলে! আমি বুঝতে পারি না এই এক ঘণ্টার ভিতর কোন প্রলয়ের ঝড় তোমার উপর দিয়ে ব'য়ে গেল যা' তোমার মধ্যে এই বৈরাগ্য, এই বিতৃষ্ণা এনে দিলে। শূন্যে কিছু দাঁড় করালে এমনি তার অবস্থা হয়ে থাকে। একটা শক্ত বাঁধন থাকার দরকার। প্রকাণ্ড জাহাজখানাও কি নঙ্গরটা না ফেলে স্থির হয়ে থাকতে পারে? আমার মনে হয় তুমি একটা ভুলের মধ্য দিয়ে

যাচ্ছ, আর বেঁচে থাকলে এর জন্য তোমায় একদিন গভীর অনুশোচনা ভোগ করতেই হবে। যারা প্রকৃতির নিয়ম ভেঙ্গে চলবে, প্রকৃতি কি তাদের উপর দিয়ে একটা তীব্র প্রতিশোধ না নিয়েই ছেড়ে দেবে। এখনো বোধ হয় সাবধান হ'লে চলে, এখনো সময় আছে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু এরপর যখন ক্ষমতার বাইরে গিয়ে পড়বে তখন—

নীহার! তোমার কাছে আমি হার স্বীকার করতে রাজি নই। তবু আজ মনে হচ্ছে—আমার হৃদয়ের যেন কোন অজানা গোপন তারে হাত দিয়ে তুমি কেমন একটা সহানুভূতির ঝঙ্কার তুলে দিয়েছ। আজ মনে হচ্ছে মিথ্যার কোনটাই ভাল না। আচ্ছা বল দেখি, আমার মত অবস্থায় একটা সত্যিকার বাঁধন কেমন করে দাঁড় করাতে

পারি। কিন্তু মনে রেখো যেন অসম্ভব কিছু একটা বলে ব'সনা।

তোমার গুরুগিরি করতে? সে আমি পারবো না। সে সাহস, সে বিদ্যা, সে বুদ্ধি আমার নেই, সে বয়সও আমার হয়নি। তবে কতকগুলো পাগলামি খেয়াল ছেড়ে দিলেই মাথাটা বোধ হয় অনেকটা হাল্কা হয়। উচ্ছৃঙ্খলতাটা যেন তোমার স্বভাবে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আত্মসংযমটা যেন তুমি ক্রমেই ভুলে যাচ্ছ, হারিয়ে ফেলছো। তুমি ত চিরদিনই বেশ লেখাপড়ার ভিতর সবই ভুলে থাকতে, কিন্তু তুমি তোমার বইগুলোকে ছাড়লে কেমন ক'রে?

ছাড়লুম—এতদিন যেন একটা হৃদয়হীনের রাজ্যে বাস করছিলুম; কিন্তু হঠাৎ একদিন কার মুখের দিকে চেয়ে রাস্তার মাঝে থমকে

দাঁড়ালুম। একটা স্পর্শ পেয়ে আত্মবিস্মৃত হ'লুম। কি একটা দারুণ তৃষ্ণায় আমার সমস্ত প্রাণটা শুকিয়ে যেতে লাগলো। যে দিকে চেয়ে এমনটি আমার হ'ল সেই দিকে আমি এখনো চেয়ে থাকি,—চেয়ে আছি। একটা ছায়া দেখে ছুটে ধ'রতে গিয়েছি, কিন্তু কোথায় মিলিয়ে গেল সে যে। কেন অমন করে সরে যায়, কেন অমন করে হারিয়ে ফেলি। আবার তখনি কোন দিক হতে উধাও হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে আমারই গা ছুঁয়ে চলে যায় সে। আমি শুধুই হাঁ করে চেয়ে রই ওই ঢেউএর রাজ্যের দিকে। তা'র ঢেউ খেলান বুক, ঢেউ খেলান কাঁধ, ঢেউ খেলান গলা, ঢেউ খেলান চিবুক, ঢেউ খেলান গাল দুটী, ঢেউ খেলান ভ্রূযুগ, ঢেউ খেলান তা'র কপাল ও চুলের

রাশির উপর হতে চোখ যে সরিয়ে নিতে পারি না। একদিন ওই ঢেউগুলো এসে আমার গায়ের উপর ভেঙ্গে পড়'ছিল। আমি প্রথমটা বাধা দিবারই চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে উদ্দাম বেগের বিরুদ্ধে আমার ক্ষুদ্র-শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। ভেসে চলেছি। আমায় ধর। আমার ছবিটা, আমার মাটির গড়া কলের পুতুলটা কে'ড়ে নিলে চ'লবে না, ভেঙ্গে ফেলবার ভয় দেখিও না। যদি তোমার মনের কোনও গোপন কোণে একটুখানিও সহানুভূতি থাকে, যদি আমারই মত কোন কিছুর সঙ্গে নিজকে কোনদিনও জড়িত ক'রে থাক, তাহ'লে নিজের বুকের উপর হাত রেখে বল দেখি, মানুষের সহ্য-শক্তির সীমা কতটুকু, সংযমের বাধা কতক্ষণ টিকে।

পিয়াসা

এস বন্যা, এস উন্মাদনা, এস মাদকতা, এস মূর্চ্ছনা, আমি তোমাদেরই বরণ করে নিয়েছি। এস ঝঞ্ঝা, এস প্রলয়, এস বজ্র, এস বেদনা, আমার বিদ্রোহী মনকে বশীভূত করবার আর যে কেউ নেই। তার বর্ণে, তার গন্ধে, তার স্পর্শে এত পিয়াসা, এত নিরাশা, এত ব্যাকুলতা! উচ্ছৃঙ্খল তার স্বরলহরী, উলঙ্গ তার হাব-ভাব, উদ্দাম তার হাঁসির রাশি, ভয়বিহ্বল তার চোখের চপল চাউনি আমার চারিদিকে আকাশে ও বাতাসে, যে শক্তি সৃষ্টি করে, তার নাম এখনও কোন বৈজ্ঞানিক আমাদের ব'লে দেয়নি। জানিনা; কি সেই শক্তি! যার কাছে মানুষ নিজকে এমনতর নীচ ক'রে দিয়ে, এমন আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নি'য়ে, এমন সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধা নিয়ে, এমন লোলুপ দৃষ্টি

নিয়ে, ভিখারীর মত আত্মবিক্রয় ক'রে বসে। তবু নাকি সে বেশী কিছু চায় না। ভিখারীর আশা মুষ্টিভিক্ষা মাত্র—সে হাতে।

তোমার চোখের কোণের নীলিমা, তোমার বুকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, তোমার হাঁসির মাঝের কালিমা, তোমার বিষাদমাখা জীবনের অসংযত ভাষা হয়ত পৃথিবীতে নূতন সাহিত্য, নূতন দর্শনের সৃষ্টি ক'রবে, কিন্তু তা'র জন্য তুমি যা সহ্য ক'রছো, সে যেন ক্রমেই সীমার বাইরে গিয়ে প'ড়ছে। আমি তোমারি কথায় ব'লতে চাই, 'মানুষের সহ্য-শক্তিরও একটা সীমা আছে। তুমি নিজকে কি মুক্ত ক'রতে, মায়া, মোহ ত্যাগ ক'রতে, নিজকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা ক'রতে পার না? একটা রাক্ষসী-লিপ্সার বশবর্ত্তী হ'য়ে যে ভাবে নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হ'চ্ছ, দিবারাত্রি যে বিকট যন্ত্রণা

সহ্য ক'রছো, তা'র চেয়ে কি সমস্যার অন্য সমাধানটা কঠিন ব'লে, জটিল ব'লে মনে কর ? যে তোমায় উপেক্ষা করে, যদি তা'কে একবার উপেক্ষা ক'রে চ'লতে পার, যদি মুহূর্ত্তের জন্য নিজের গতিপথ পরিবর্ত্তিত ক'রতে পার, দেখবে, স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস কত স্নিগ্ধ, কত মধুর, কত প্রাণস্পর্শী, কত তৃপ্তিদায়ক ! আর তুমি যেদিকে যাচ্ছ অমিয়, যে আকাশ কুসুমের স্বপ্ন কল্পনায় চোখে দেখছো, যে মরীচিকার পিছনে নিজকে ছুটিয়ে দিয়েছ, তাতে তৃপ্তি কোথায়, নিবৃত্তি কোথায়, পূর্ণতা কোথায় ! তুমি যে আগুন নি'য়ে খেলা আরম্ভ ক'রেছো, তাতে তোমার সোনার শরীরটাকে ছাই ক'রে দিবে মাত্র। মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন জীবে পরিণত হওয়া কখনো মানব-জীবনের লক্ষ্য হ'তে পারে

না। ভগবানের মহৎ দান—তোমার মানব-জন্ম—যদি এমন ক'রে নষ্ট ক'রে যাও, তাহ'লে যখন তাঁ'র কাছে এর একটা কৈফিয়ৎ দিতে দাঁড়াবে, তখন উত্তরটা কি দিবে কখনো ভা'ববার অবসর পেয়েছ কি ?

আমার ব্যর্থ-জীবনের সবখানি কষ্ট তোমার চোখের সামনে ধ'রতে পারি, সে নির্লজ্জতা আমাতে কৈ নীহার। যদি ভা'ববার ক্ষমতা থা'কতো, যদি জীবনের কোন মূল্য আছে ব'লে বিশ্বাস থা'কতো, 'আরও আছে' জ্ঞানটা যদি ঠিক ভাবে মনের মধ্যে দাঁড় করাতে পা'রতুম, হয়ত তোমারই মত একটা সাদা জীবন আমারো কেটে যেত। কিন্তু যে তার সমস্ত জীবনটাকে একটা অভিশাপ ব'লে গ্রহণ ক'রেছে, সমগ্র জগৎ যার সঙ্গে এমন আড়ি পেতে বিদ্রূপের হাঁসি ছড়িয়ে

ছ

চ'লেছে, সে যে কারো কাছে কৈফিয়তের জন্য দায়ী, এ বিশ্বাস মনে তা'র কেমন ক'রে স্থান পায়। স্রষ্টার এ উপহাস আমি মাথা পে'তে গ্রহণ ক'রতে পা'রছি কৈ? কেউ যদি আমায় এমন অসম্পূর্ণ ক'রে ফেলিয়ে রাখতে চায়—আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি আমি বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিই, সে কি আমারই দোষ? সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হ'তেই কোন অজানা অঙ্গুলি সঙ্কেত লক্ষ্য ক'রে কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে চলেছিলুম। পথে যা দেখতুম তা'রি দিকে চেয়ে রইতুম, যদি আমার জীবনান্তের হারান জিনিষটার বিকাশ তার মাঝে দেখতে পাই। সুন্দর গোলাপ—তা'র প্রত্যেক পাপড়িটা ছিঁড়ে নিংড়ে তা'র খোঁজ করেছি, পাইনি—দূরে ছুড়ে ফেলে দি'য়েছি। স্নিগ্ধ জ্যোছনা—কত চাঁদনি রাত,

তার আশাপথ চেয়ে কাটিয়েছি, পাইনি —নীরবে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছি। সুশীতল প্রভাত— ফুলের প্রথম গন্ধে, পাখীর প্রথম কূজনে, সূর্য্যরশ্মির প্রথম বিকাশে আমার আকুল চেষ্টা ভেঙ্গে প'ড়েছে—হতাশ প্রাণে দূর চক্রবালের দিকে চেয়ে বসে প'ড়েছি। মলয় বাতাসে কা'র নিশ্বাসের বেদনা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছি—ব্যর্থতা বরণ ক'রে নিয়েছি! ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের আবেশে কার খোঁজ ক'রেছি! কা'র অনুসন্ধানে দেশবিদেশে, জাহ্নবী যমুনার তরল বক্ষে, গিরিগহ্বরের নিভৃত কোটরে, সাগরসৈকতে আমি পলে পলে আত্মহত্যার পাপ মাথায় তুলে নিয়েছি! আমি পাগল প্রাণে, উধাও মনে তাকে খুঁজতে গিয়ে, কতবার লাঞ্ছিত হয়েছি, তবু তার আশাপথ কি কোন দিন ছ'াড়তে পে'রেছি? তোমরা

পিয়াসা

যাই বল, আমি কিন্তু নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় স্বীকার ক'রছি—পারিনি। যার মায়া-বিজড়িত ভাবের মোহ এখনো আমার চোখের সামনে ঘু'রছে, যার হাঁসির হিল্লোল এখনো আমার কাণে প্রতিঘাত ক'রছে, যার বুকের স্পন্দন এখনও আমার রক্তের মাঝে খেলে বেড়াচ্ছে, যার নিশ্বাসের উষ্ণতা এখনও আমার গায়ে লেগে আছে, আমি তাকে ভু'লবো ! প্রকৃতি তাই নিথর হ'য়ে দে'খবে ! অসম্ভব। তাকে ছেড়ে যে আমার স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সে যে আমার মনের ছায়া !

১১ই মার্চ্চ, ১৯২৪

রাজমহলে কয়েক সন্ধ্যা

এই কি সেই মানসিংহের রাজমহল ! এই কি তুমি সেই রাজমহল যার বুকে বুভুক্ষিত সিরাজের মুখের গ্রাস ভূপতিত হয়েছিল ? এই কি সেই রাজমহল যে মিরণকে তার বুকে স্থান দিয়েছে ? এইখানেই কি বঙ্গ তার কাসিমকে হারিয়েছিল ? তবু এখানকার কিছুই আমার চেনা নেই, তাই একটু ধীরে ধীরে ষ্টেশনে পাইচারী করে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ প্রশান্ত, প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষের উপর চোখ পড়তে ষ্টেশনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। তা'রি দিকে ছুটে গেলুম। তীরের উপর বসতে প্রাণের ভাব বদলে গেল।

এখনও ভাল হয়ে রাতের আঁধার যায়নি। পশ্চিমাকাশে বড় চাঁদটা আর পূর্ব্বাকাশে একটা মস্ত তারা এখনও হাঁসছে, মলিন হয়নি—বুঝি মলিন হবার নয়। কাল কোকিলটা প্রভাত আগমনী রাজমহলকে জানাচ্ছে। গঙ্গাবক্ষে সারি সারি নৌকা, আর দূরে একখানা বড় ষ্টীমার বেশ মধুর দর্শনের সৃষ্টি করেছে। বহরমপুরের ভাগীরথীর সহিত এখানকার গঙ্গার তুলনা হয় না। কেবল প্রশস্ততাতে নয়; উভয়ের মধ্যে খুব বড় প্রভেদ এই যে, আমাদের ভাগীরথী বড় বেশী এঁকে বেঁকে শীঘ্র লোক চক্ষুর আড়ালে চলে গেছে। একস্থানে বসলে তার সামান্য একটু দেখা যায় মাত্র। কিন্তু গঙ্গা এখানে সেরূপ নয়। দুইধার কেমন যেন তার আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। বড় সুন্দর

দৃশ্য! না জানি সাগর-সঙ্গমে আকাশের দৃশ্য আরও কি অপরূপ শ্রী ধারণ করে।

এই এতক্ষণ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। দেখতে দেখতে গঙ্গাবক্ষের উপর কোথা হতে ছোট্ট এক টুকরা মেঘ উঠলো। সত্য বলতে কি, পনের মিনিটে সমস্ত আকাশটা কালো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়। নদীবক্ষে নৌকাগুলি ভয়ে জড়সড় ভাব ধারণ ক'রলো। আর গঙ্গাতীরে বসা যায় না। কোথায় যাব? এ অচেনা দেশে কে স্থান দেবে!

ষ্টেশন ছেড়ে বাজারের দিকে গিয়েছিলুম। বাজারের ছবিটা আঁকবো কি? না তাতে তোমার বেজায় হাঁসি পাবে, তার দরকার নেই। তবু দু'একটা কথা না বল্‌লে বুঝি অন্যায়ই করা হয়। বড় ক্ষিধে পেয়েছিল তাই বাজারে গিয়েছিলুম। মিষ্টির দু'টো

দোকান বই সমস্ত বাজার খুঁজে আর দোকান পাই না। বহুকষ্টে একটা তৃতীয় দোকান আবিষ্কার করে খেতে গেলুম। যা খেলুম তা তোমারা কেউ খেতে পারতে কি না জানিনা, কিন্তু অন্যোপায়হীন আমি তাই খেতে লাগলুম। পেটের কিন্তু সহ্য হলোনা। গা বমি বমি ক'রতে লাগলো। আর না— পাতাসমেত মিষ্টি সেখানেই ফেলে রেখে জল চাইলুম। জল দিল। খেলুম। তারপর পয়সা দিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছি, তখন দোকানীর কাছ হ'তে 'মহাশয়! যাচ্ছেন যে, এঁটো ফেলবে কে?' শুনে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম। কোন দিন জানতুম না যে আহার করে তাকেই স্থান পরিষ্কার করতে হয়। মনে মনে এই সুনিয়মটার প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না। কিন্তু যা কোন দিন জীবনে করিনি,

তা বাধ্য হয়ে করবার পাত্রও আমি নই। জোরের স্থানও নয়। কাজেই, দু'চার পয়সা সেলামী দিয়ে দোকানী দ্বারাই স্থান পরিষ্কার ক'রালুম। পয়সা নিবার এও একটা মন্দ উপায় নয়! আজ কুক্কুর হতেও হীন হয়ে, হেয় হয়ে, দোকানের দূর একপ্রান্তে বসে খেয়ে এলুম। নইলে উপায় কি ছিল? গঙ্গার জল এত অপরিষ্কার যে তা মুখে দেওয়া যায় না। ষ্টেশনে জলের কোন বন্দোবস্ত নেই। সকালে গঙ্গার ধারে মুখ ধুতে গিয়েছিলুম, পারলুম না। বড় বেশী ময়লা। একহাঁটু জলে না নামলে ব্যবহার উপযোগী জল পাওয়া যায় না। অথচ পায়ে বুট এঁটে সে সুবিধাটুকু ঘটে উঠে কই? জানিনা, কবে মুসলমানকে আর এমন 'পারিয়ার' মত এসে দাঁড়াতে হবে না। ভারতে

জ

ইংরাজ বয়কট আজ দুদিনের। তাতেই রাজার জাতি ব্যস্ত, ত্রস্ত। আর মুসলমান বয়কট, সে আজ ৫০০ বৎসরেরও পুরাতন। কে বলতে পারে কবে, কি ভাবে, এই 'ছুঁসনা, ছুঁসনা' ভাব দূরীভূত হয়ে ভারতের প্রকৃত উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেবে। ভারতের ধর্ম্মে ও কর্ম্মে প্রেমের প্রভাব বিস্তারিত হবে।

ওই দূর গঙ্গাবক্ষ হতে পর্ব্বতশ্রেণী ধীরে ধীরে কোথাওবা হঠাৎ উঠে আকাশের গা ভেদ করে কোথায় মিশে গেছে। আর দেখা যায় না। বড় সাধ খুঁজে দেখবো কোথায় গিয়েছে। সঙ্গীহীন আমি পায়ে হেঁটে একাই ওই গিরিময় দেশে বেড়াতে এসেছি। জানিনা, যাদের আপন বলে জানি, এ জীবনে তাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে কি না!

কি বীভৎস দৃশ্য ! যদি এ সময় তোমাদের কাউকে সঙ্গে পেতেম, তাহলে প্রকৃতই বড় সুখী হতেম। কত নূতন নূতন দৃশ্য পর পর চোখের সামনে আপনা হতে এসে পড়েছে, কে তার ইয়ত্তা ক'রবে। মরুভূমি কখনও জীবনে দেখিনি। তবে যদি মরুভূমি না দেখেও তার ধারণা করতে হয়, তাহলে এই তার স্থান, এই তার সময়। এই ১২টা ৩০ মিনিটের সময় মহারাজপুর ষ্টেশনে এসে উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দিকে মুখ ফিরিয়ে যদি দাঁড়ান যায়, সে ধারণা কতকটা হতে পারে। যতদূর চোখ যায়, কেবল উজ্জ্বল, অনন্ত বালুরাশি। সত্য বলতে কি, প্রথম দৃষ্টিতে আমি বেজায় ঠকে গিয়েছিলেম। মনে হয়েছিল, আবার বুঝি রাজমহলের গঙ্গা ঘুরে দেখছি। ভয়-চকিত চোখে তারি দিকে চেয়ে রয়েছিলেম।

অনেকক্ষণের পর গোটা কয় সানতাল বালককে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ‘ ওটা কি ?’ তারা আবার আমার কথা বুঝে না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে। অনেক চেষ্টার পর উত্তর পেলুম ‘বালু’। তখন মনে যে কি ভয়াবহ ভাবের উদয় হ'ল তা বলতে পারিনা। না জানি পৃথিবীর বড় বড় মরুভূমির দৃশ্য কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র !

মহারাজপুর মাঠের মাঝে জনসমাগমশূন্য একটী ছোট ষ্টেশন। তারি বুকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কয়েকটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। একটা তাদের আট কি নয় বছরের। সে মার্বেল খেলতে বড় ভালবাসে। সঙ্গী তার সানতাল বালকগণ। এখানে কোনও ভদ্রলোকের বাস নেই। সকলই সানতাল। কেহবা পাহাড়ের নিম্নদেশে, কেহবা উচ্চতর

পাহাড় গায়ে ঘর বেঁধে বাস করছে। শরীর তাদের অসুরের মত। সাহস তাদের অসীম।

বড় বিপদে পড়েছি এখানে এসে। না আছে দোকান, না আছে খাবার জল। ওগো কেউ কি তোমরা আমার ধর্ম্মের, আমার বয়সের আমাকে একটু জল দিতে পার না? পিপাসায় আমার বুক যে ফেটে যায়! এখন এই দুপুর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ ওই উত্তপ্ত বালুর চর অতিক্রম করে নদীতীর পর্য্যন্ত যাবার মত শক্তি যে আমার নেই গো! ভয় ক'রছে, যেতে সাহসও হচ্ছে না, যদি গঙ্গা আমায় দেখে সরে যায়! হতাশ নয়নে, বাইরে একখানা বেঞ্চের উপর বসে ঐ ছেলে খেলার দিকে চেয়ে রইলুম। নিজ বিপন্ন অবস্থার কথা ভাবতে লাগলুম।

দেখলাম, ষ্টেশনে একটী হুগলী জেলার বাবু কাজ করছেন। কাজ শেষ করে এসে 'কোথায় যাবেন' প্রশ্ন যখন তিনি তুললেন, তখন যে কি উত্তর দিই সে আর ভেবে পাইনা। একটু ইতস্ততঃ করে আমি যে শুধু পাহাড় দেখতে এসেছি সেটা জানিয়ে দিলুম। তিনি ত শুনেই অবাক 'এত দূরদেশে শুধু পাহাড় দেখতে'। আর কি বলবো—চুপ করে রইলুম। কথায় কথায় পরে জানলেম, এখানকার সব হ'তে দেখতে সুন্দর 'মতি ঝরণা'। সেটা নাকি মহারাজপুর ষ্টেশন হ'তে ৩ মাইল দূরে। কেমন করে যাব, সেখানে যে বাঘের উপদ্রব বড় বেশী। এই পর্ব্বতময় দেশে অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে যাওয়া একটু আয়াসসাধ্য বলেই মনে হচ্ছিল।

আমার দিনে ঘুমান অভ্যাস আদৌ নেই তবুও আজ ঘুমালেম। কারণ কি জান? গত রাতটা জেগেই আমার কেটেছিল। কেন জেগেছিলুম? রাত্রি ৯টায় সিউড়ি ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠি। তারপর সাঁইথিয়াতে গাড়ী হ'তে নামি। সেখানে রাত্রি ১২টায় পশ্চিমের গাড়ী পাওয়া যায়। কাজেই না বসে থেকে করি কি? গাড়ী সময় মত এলো। যে কামরাটীতে উঠলুম তাতে ৪খানি শু'বার উপযুক্ত বেঞ্চ ছিল। কিন্তু লোক ছিল মাত্র তিন জন। আমি যাওয়াতে ৪র্থ বেঞ্চটাও পূর্ণ হলো। পূর্ণ ইচ্ছা শুই। দেখলুম আমার পাশের বেঞ্চে একটা ১৪ বছরের কে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শায়িত। আমার চোখ, আমার মন আমার নিতান্ত অবাধ্য হ'লেও তাদের উপর অত্যাচার করে ধীরে ধীরে শুয়ে

পড়লুম। চোখ বন্ধ করে রইলুম, ঘুম কিন্তু এলো না। ইতিমধ্যে গাড়ী দু'টো ষ্টেশন ছেড়ে রামপুরহাট এসে পড়লো। বাধ্য করে, অত্যাচার করে সবারই ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে, ছোকরা এক টিকিটবাবু। আমাকেও উঠতে হলো। আর শুতে পারলুম না। ধারের বেঞ্চখানায় গিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলুম। একজন লোক নেমে যাওয়ায় ঐ বেঞ্চটাও ইতিমধ্যে খালি হয়েছিল। জানলার ফাঁক দিয়ে প্রাণশূন্য প্রকৃতির ছবি দেখছিলুম। কোন একটা দূরের কামরা হতে গানের সুর ভেসে আসছিল। চাঁদ সকলকে নিয়ে হাঁসছিল।

সতের বছরের আমার তখন পড়বার সাধ খুব বেশী না থাকলেও সঙ্গে দু'একখানা বই ছিল। তা'রি একখানার উপর জোর করে

চোখ দিয়ে রইলুম কতক্ষণ। কিন্তু শেষে আর তা পারলুম না, নির্ম্মম তার আকর্ষণে। সে কত প্রশ্ন! কত খুটিনাটি কথা! সরল তার হাব-ভাবে, সহজ তার মুখের কথায় জানিয়ে দিলে, 'পেশোয়ারের' কোন আঙুর বনের ধারে সে থাকে। আর আজ সেখানেই সে যাচ্ছে। 'কামিক্ষ্যা' কেমন করে অতদূর একাকী যাবে, ভাবতে ভয় করতে লাগলো। গোরাদের পোষাক পরা মিষ্টিমাখা কচি কামিক্ষ্যাকে কে এমন করে ছেড়ে দিয়েছে!

দেখতে দেখতে 'তিনপাহাড়' ষ্টেশন চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় শীঘ্র এলো বুঝি!—যদি অনন্তের অপর পারে হ'তো! তার 'ভুলবেন না' কথা আজও আমার কাণে তেমনি বাজছে। সেদিন

ঝ

থেকে ১৪ বছর কেটে গেছে কিন্তু সে হাব-ভাব, সে ছোট ছোট কথাগুলো কৈ আজোতো ভুলতে পারিনি। এ জীবনে কত লোকের সংশ্রবে এসেছি, কিন্তু এ সংসারের কোথাওত এরূপ প্রাণমাতান ভাবের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আর একটা 'কামিক্ষ্যা' দেখি নাই।

আমার নিদ্রালস ক্লান্তি-কাতর দেহখানিতে যখন চেতনা ফিরে পেলুম তখন দেখি বিকালের সূর্য্যকে মেঘে ঢেকেছে। ভয় হ'ল আর বুঝি আজ ঝরণা দেখা হয় না। কিন্তু চোখ মুছে ভাল করে চাইতেই সে ভাবনা কেটে গেল। দেখি 'টিকিটবাবুটী' একবারে সেজে গুজে আমারই কাছে দাঁড়িয়ে, আমারই দিকে চেয়ে আছেন। ক্ষুধিত চোখের কি লোলুপ দৃষ্টি সে! আমি 'না' বলবার অবসর পর্য্যন্ত পেলুম না। তিনি আমার

সতের বছরের দেহটাকে নিদ্রার নিবিড় পাশ হ'তে মুক্ত করে, এখন নিজে ধরে টানাটানি করছেন। কিন্তু সন্দিগ্ধ মন আমার, কেমন যেন একটা বাধার স্থষ্টি করে, পিছু পা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমার সদাই মনে হচ্ছিল একি শুধু নিয়তির টানে আমি কোন অজানা পথে এমন ভাবে চলেছি। একটা বাঘ বুঝি হাঁ করে আমারই প্রতীক্ষায় অলক্ষ্যে বসে আছে। তবুও কে যেন আমায় টেনে নিয়ে চল্লো।

চারিদিকে গভীর অরণ্যানী সমাকীর্ণ পাহাড়। তা'রি মধ্য দিয়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে পথিক আমরা দুজনে চলেছি। যে দৃশ্য দেখবার জন্য এমন প্রাণভরা সাধ নিয়ে কোন দূরদেশ হ'তে ছুটে এসেছি, আজ তা'রি মাঝে এসে সদাই মনে হচ্ছে বড় ভুল করেছি।

মন একেবারে দমে গেছে। আলোকের রাজ্যে বিষাদ আঁধার ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে। আর তারই সামনে ওই অদূরে সন্ধ্যার নীলিমা নেমে আসছে। চারিদিক যেন কেমন একটা জড়সড় ভাব ধারণ করছে। বুকের রক্তে কিসের যেন একটা শীতল স্পর্শ বেশ অনুভূত হচ্ছিল। সন্ধ্যার আঁধারে যখন জাগুয়ার, চিতা তাদের শিকার খুঁজতে বেরুবে তখন যদি তাদের সামনে এসে পড়ি, তা হলে যে এই লুকোচুরির শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেও প্রাণ শিউরে উঠছিল। পথে চলে যেতে কতবার সামান্য শব্দে চমকে উঠে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে সাহায্য ভিক্ষা করেছি, আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই অজানা, অচেনা পথ ধরে আর যে যাওয়া যায় না।

দূর হ'তে কার বাঁশরির তান বাতাসে ভেসে আসছিল, মধুর আশ্বাস-বাণী তার সঙ্গে নিয়ে। ক্রমেই কাছে সরে আসছিল সে। যখন আমারই বয়সের একটা কাল ছোঁড়া, ফুলের মালায় এক অদ্ভুত সাজে সেজে, বাঁশী হাতে কাছে এসে দাঁড়ালো, ঘাড় নেড়ে যখন সঙ্গে যেতে সম্মতি জানালে, তখন মনে হ'ল, এ বুঝি বৃন্দাবনের সেই কাল ছোঁড়া বিপদবারণরূপে দেখা দিয়েছে! এ বুঝি অযোধ্যার সেই কাল ছোঁড়া!

প্রায় ৪০০ ফিট উপর হতে ঝরণার জল মুক্তার মত ঝর ঝর করে পড়ছে। ডুবু ডুবু সূর্য্যের সোণালী আলো তার উপর প'ড়ে চারিদিকে রামধনুর রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত পাহাড়টা যেন একখানা আস্ত পাথর দিয়ে গড়া বলে মনে হয়। উপর হ'তে জল

পড়ে পাহাড়ের পাথর-বুকে ছোট একটা হ্রদ গড়েছে। তারই এক প্রান্ত বেয়ে পাহাড়ের বুকের রস সানতাল পল্লীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তেমন সুন্দর, স্বচ্ছ পেয় নাকি এ দেশে আর নেই। তাতে নাকি সকল রোগ সেরে যায়। আমরা তাই অঞ্জলি পুরে—প্রাণ ভরে খেলুম। গায়ে মাথায় মাখলুম। ওগো! তোমরা কি কেউ বলতে পার আমার রোগ সেরেছে না বেড়েছে?

একপাশে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর। সন্ধ্যার আঁধারে সেটা কি ভীষণ দেখাচ্ছিল তা না বল্লেও বুঝতে পারা যায়। শুনলুম সেখানে নাকি কত মূল্যবান পাথর ভাগ্যবান লোকে কুড়িয়ে পায়। সাধ হ'ল খুঁজে দেখি। কিন্তু তার ভিতর ঢুকতে বুক আমার কাঁপতে লাগলো। পারলুম না। আমার দুঃখ হয়

বেচারা টিকিটবাবুটীর জন্য। সেই আঁধারে, প্রাণের সব মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে, রতন লাভের কি সে চেষ্টা!

উপরে গাছের ডগায় ডগায় একপাল বানর বসে, আমাদের দিকে তাকিয়ে, দাঁত বের করে হাঁসছিল। মাঝে মাঝে তারা এক একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে তামাসা দেখছিল। বছরে একবার এখানেই সানতালদের মেলা বসে। 'মতি ঝরণা' নাকি তাদের পুণ্যতীর্থ। মেলার সময় এমনি পাথর গড়িয়ে বানরে নাকি অনেক খুন জখম করে থাকে। বানরের ঢিল খেয়ে মরতে পারলে নাকি তখন তখন স্বর্গলাভ হয়। গহ্বরের এক কোণে একটা গোল মসৃণ পাথরে তারা সিঁদুর মাখিয়ে রেখেছে। সেটা নাকি ঠাকুর তাদের, দেবতা তাদের!

পিয়াসা

আজ দুপুরে প্রকৃতির অশান্ত একটী ছেলে সাহেবগঞ্জের বড় রাস্তার ধারে একটী অশ্বত্থ গাছের তলায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে তৃণশয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। ঢের সয়েছে সে। প্রথম জীবনের নবীন উন্মাদনা নিয়ে বুঝেনি বাইরের জগতটা কেমন। আজ ক'দিন সে সানতাল পল্লীতে পল্লীতে সানতাল বালকদের সঙ্গে তাদের রীতি নীতি, তাদের আচার ব্যবহার, তাদের ভাষা শিখে কাটিয়েছে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঘুরেছে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এ আড়াআড়ি ক'দিন চলে। শরীর কত সইবে। এ কয় দিনের অনাহার, অনিয়ম ও অনিদ্রায় সে এক কালীন ভেঙ্গে পড়েছে। বিকেলে যখন এক পাল ছেলের চেঁচামেচিতে ঘুম তার ভাঙ্গলো, তখন গায়ে অনেকখানি জ্বর।

আবার তারই উপর কত প্রশ্ন! কেউ মনে ক'রোনা এই পাহাড়ে দেশের ছেলেগুলোর প্রাণ এখানকার পাথরের মতই শক্ত, একবারে সাহানুভূতি শূন্য। তারা যখন কোন সুদূর দেশের অপরিচিতের শয্যাপার্শ্বে ব'সে তার শুশ্রূষা করে, তাকে দুধ এনে খাওয়ায়, তাকে ধরে এনে ট্রেণে তুলে দেয়, টিকিট কিনে তার পকেটে গুঁজে দিয়ে যায়, তখন কি শতমুখে তাদের প্রশংসা না করে পারা যায়! ভারতের আতিথ্য-সৎকার চিরদিন যেন এমনটীই থাকে।

২৭এ মার্চ্চ, ১৯১০

সুন্দরবনে শিকার।

ভাগীরথী আজ সাগর সঙ্গমে এসেছে। 'মাতোয়ারা সে, আনন্দবিহ্বলা সে, বিক্ষোভিত তার বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা নিয়ে সে নেচে চলেছে, ছুটে চলেছে। কূল তার ভেসে গেছে আলোড়িত তার বুকের চাপে, লক্ষ্য নেই, দৃকপাত নেই। ক্ষুদ্র মোদের পানসী ভয়ে যে সে জড়সড়, জানিনা কেমন করে পাড়ি দেব। পালে একটা দমকা হাওয়া লেগেছে, মাঝি দু'হাতে হাল চেপে ধরে আছে, আর দু'টো ছোঁড়া দাঁড় হাতে ঢেউর সঙ্গে যুঝ্‌ছে। মাথা আমার ঘুরছে, গা আমার বমিবমি করছে, প্রাণ আমার কাঁদছে। রেঙ্গুন মেল প্রলয়ের তুফান তুলে সামনের

দিকে আসছে। প্রকাণ্ড একটা বিশ্বগ্রাসী কুমীর হাঁ করে পাশাপাশি ভেসে চলেছে। অদূরে একটা ঘূর্ণি—সাগরের সব জল যেন তারি ভিতর দিয়ে পাতালপুরীর পথে চলেছে। মিশমিশে কাল একটা সাপ, একটা কাঠকে আশ্রয় করে, তারি মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আজ ৫০ মাইল বেয়ে নুরপুরের মাঝি, আঁধার রাতের ৯টার সময়, বড় নদীটা ছাড়িয়ে, 'মুড়ীগঙ্গার' সঙ্কীর্ণ একটা খালের ভিতর ক্লান্ত তার নৌকাখানা এনে চৌপাড়ি করে বাঁধলো। এক পাশে তার সেখানকার থানা, আর এক পাশে গভীর জঙ্গল। ভয় করছিল পাছে তখন একটা বাঘ বে'র হয়ে আমাদের ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে পড়ে। আশায় বুক বেঁধেছিলুম শুধু ওই থানাটার দিকে চেয়ে। সারাদিন ঢেউর নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাত

সহ্য করে এসে ভাববার সময় বেশী পাইনি, শান্তিদায়িনী, বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে সরে গিয়ে। রাত দুপুরে হঠাৎ ভীষণ একটা নাড়া খেয়ে লাফ দিয়ে উঠলুম। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল বুঝি বাঘেই ধরেছে কাউকে। তাকিয়ে দেখি সে খালে জল নেই। শুকনো চড়ার উপর নৌকাখানাকে ধরে ক'জন মিলে টানাটানি করছে। প্রথম দৃষ্টিতে যেন একটা যাদুকরের রাজ্যে এসে পড়েছি ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল তখনো বুঝি ঘুমের ঘোর কাটেনি, ভয় হচ্ছিল বুঝি অচিন্তনীয় কিছু একটা ঘটেছে। পরে শুনলুম, জোয়ার তার জলের রাশি নিয়ে চলে গেছে, নদীতে তখন ভাটা। নৌকাখানা বাঁধবার সময় ঠিকভাবে চৌপাড়ি করা হয়নি বলে সে উলট খেয়ে জীবন্তে

আমাদের সমাধি করবার ব্যবস্থা করছিল। পরদিন জোয়ারের জলে নৌকা না ভাসলে আমাদের সেখান হ'তে বেরুবার আর অন্য উপায় নেই। সে রাত্রি শুকনো ডাঙ্গায় নৌকায় বসে কাটালুম, বনের দিকে চেয়ে, বুকের কাছে বন্দুকটা টেনে নিয়ে। এইটাই বুঝি এখানকার সব হ'তে আদরের।

যে সুন্দরবনের সহিত আমার বাল্যের, আমার ছাত্রজীবনের কত স্মৃতি জড়িত হ'য়ে আছে, 'বরাতলার' প্রশস্ত বুকে ভাসতে ভাসতে দূর চক্রবাল রেখার গায়ে যখন তারি প্রথম ছবিটা ফুটে উঠলো, যখন 'ক্রমেলিয়ান, মৌশুনি' দ্বীপগুলি একটীর পর একটী করে ধীরে ধীরে বায়স্কোপের ছবিটীর মত আমার চোখের সামনে সরে যেতে লাগলো, জীবনের সেই শুভ মুহূর্ত্তে ঐ অনন্ত নীলিমার দিকে

পাগল প্রাণে চেয়ে রয়েছিলুম। একটুও বুঝতে পারিনি ধীরে ধীরে কখন তাদেরি মাঝে, লোকালয় ছেড়ে বহুদূরে এসে পড়েছি। হরিণ, সে বিচিত্র-দর্শন আমাদের দিকে চেয়ে উধাও প্রাণে বনানীর বুকের ভিতর আশ্রয় নিল। বরার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে তেমনি কাদা মাখতে লাগলো। কুমীরগুলোর কুটিল চোখে কি তাচ্ছিল্যভাব! সাপগুলো কিল বিল করে বেড়াচ্ছে। কত রঙ বেরঙের কাঁকড়া, কত ছোট হ'তে কত বড় হয়েছে তারা। বন্য কুক্কুট ডাক দিয়ে উড়ে পালালো। বানরগুলো কিন্তু গাছের ডগায় বসে তেমনি বিশ্রী ভাবে মুখ ভেঙচাতে লাগলো। প্রকৃতই যেন একটা নূতনের রাজ্যে এসে পড়েছি। গাছগুলো পর্য্যন্ত নূতন, সব অচেনা।

বেলা এখন ১টা। আমরা অপেক্ষাকৃত একটা ক্ষুদ্র নদীর ভিতর এসে পড়েছি। দূর হ'তে 'চামাগড়ে' নদীতীরস্থ মনসাদ্বীপ বাঙ্গলো ওই দেখা যায়। আমার আমেরিকা! কি আনন্দ! কি স্ফূর্ত্তি! পূজার ছুটীর একমাস এখানেই কাটাতে এসেছি। বাঙ্গলোয় উঠে প্রাণের মাঝে যে অভূতপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করেছিলুম তার আস্বাদ আজও ভুলতে পারিনি। ঢেউ খেলান সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে মনসাদ্বীপ বাঙ্গলো. ছবিটী যেন, আজও আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আমি বন্য কুক্কুটের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তুম, আবার তারি ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গতো। সেখানেই রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কত যূথভ্রষ্টা হরিণীর কাতর চীৎকার কত সময় আমার কাণে ভেসে

আসতো। আবার সেখানেই 'সুপ্তা রজনীর নীরব কোলে যখন ব্যাঘ্রের রোষ-গর্জ্জন অন্ধকারের বুক ভেদ ক'রে আসতো তখন মনে যে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হ'তো তা আজও আমার মনে তেমনি জাগছে। ওগো মনসাদ্বীপ! তোমার স্মৃতি আমার পুরাতন হবার নয়। তোমার বুকে, তোমার শত সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের মাঝে, যদি কোনদিন কোন অসুবিধা বোধ ক'রে থাকি ত সে একমাত্র পানীয় জলের। প্রকৃতি তার জন্য দায়ী, তুমি নও। মাইল খানেক দূরের তোমার সেই মিষ্টি জলের পুকুরটা আজও মনে পড়ে। চারিদিকের সেই লোনা, বিশ্রী ময়লা জলের কথা কোনদিনই ভুলতে পারবো না। আমি আজও বুঝতে পারিনা, কেমন করে লোকে তাতে

স্নান করে তৃপ্তি পায়! আমি আজও বুঝতে পারি না কেমন করে লোকের তাতে শরীরের ময়লা, মনের ময়লা ধুয়ে যায়! আমি অবাক নয়নে চেয়ে রইতুম সেই উড়ে মেড়োগুলোর দিকে যখন তারা ঘটি ঘটি সেই জল মাথায় তাদের ঢালতো। হাঙ্গরের ভয়ে বুঝি নদীর হাঁটুজলে নামতেও তারা সাহস করতো না।

বাঙ্গলোর রক্ষক 'রমা' সেদিন যে ভাবে আমাদের গ্রহণ করলে, তাতে শুধু স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম, মুগ্ধমনে ভাবতে লাগলুম—'এ কে?' যৌবন কঠিন দীর্ঘ তার শরীর, মুক্ত তার হাব-ভাব, সুঠাম তার দেহের গঠন, তীব্র তার চোখের চাউনি। সে বুঝি এ জঙ্গলের 'টারজান'। 'ভয় করে না রমা' বল্লে, সে শুধু মুখের দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাঁসি হাঁসতো।

ট

পিয়াসা

ভাল শিকারী বলে তার নাম-ডাক আছে। দু' একটা বাঘও সে মেরেছে। জঙ্গলের কোন অংশে ক'টা বাঘ আছে, কতদূর নিয়ে তারা ঘুরে, হরিণগুলোই বা কোথায় কখন থাকে, সে খবর 'রমা'র যেমন জানা আছে এখানে আর কারুর বুঝি তেমন নেই। শিকারে যাবার কথা শুনলে সে এমনি ব্যস্ত হয়ে উঠতো যে তাকে সেদিন আর কোন কাজের মধ্যে পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াতো।

আজ সন্ধ্যায় আমরা শিকারে বেরুবো; অবশ্য বাঘ শিকারে নয় হরিণ শিকারে। শিকারে যাবার কথা শুনে 'রমা' ধরে আনলে মেদনীপুরের এক ভদ্রলোককে। তিনি তখন সেখানে বেড়াতে এসেছিলেন। সঙ্গে এলো তাঁর এক ভাইপো। ম্যাট্রিক দিয়ে

সেও বেড়াতে এসেছে। শিকারে যাবার লোভ সেও সম্বরণ করতে পারেনি।

বেলা তখন ৪টা যখন আমরা পাঁচজন তিনটে বন্দুক নিয়ে হরিণ মারবার জন্য বাঙ্গলো ছেড়ে নৌকায় গিয়ে উঠলুম। মাঝি শুধু 'চামাগড়ে' পার করে দিল মাত্র। বলে দিলুম সে যেন নৌকা নিয়ে শিকারপুর জঙ্গলের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। বন্দুকের শব্দ না শুনা পর্য্যন্ত যেন না আসে। নদীতে তখন জোয়ার। মাঝিকে স্রোতের প্রতিকূলে যেতে হবে। সেত কোন মতেই রাজি হবে না। সে যে এতদিন স্রোতের অনুকূলেই নৌকা চালিয়ে এসেছে। আজ এ নূতন নিয়ম মানতে সে নিতান্ত নারাজ। কিন্তু মফস্বলে ডেপুটীবাবুদের হুকুম অমান্য করে এত বড় বুকের পাটা কার।

বেচারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের নামিয়ে দিয়ে নৌকা নিয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে চলে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাগর দ্বীপটা প্রায় ৩২ মাইল লম্বা এবং কোথাও কোথাও প্রায় ১৬ মাইল চওড়া। গভর্ণমেণ্ট বছর বছর এর জঙ্গল কেটে আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। তাই সাগর দ্বীপের কয়েকটা বিশিষ্ট অংশ ছাড়া আর সবই এখন চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। আজ যখন সেপ্টেম্বরের বিকালে আমাদের পাঁচজনকে, সাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে, শিকারপুরের কালা জঙ্গলের ধারে নামিয়ে দিয়ে নৌকাখানা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন বুকের মাঝে যে ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলুম তা' সহজেই অনুমান করা যায়। সদাই মনে হচ্ছিল একি ভুল করলুম। তখন কিন্তু দাঁড়িয়ে

ভাববার সময়' ছিল না। নৌকা চলে গেছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। বাঘ বেরুতে, হরিণ বেরুতে আর বিলম্ব নেই। হয়ত পথেই দেখা হবে। 'রমা' দু' কথাতেই বুঝিয়ে দিলে কেউ যেন মুখে কথাটী না আনে, কেউ যেন পায়ের শব্দটা না করে, শুধু নির্ব্বাক কলের পুতুলের মত নিঃশব্দে তার অনুসরণ করতে হবে, তা' না হলে সে সন্ধ্যায় প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমরা ঘাড় নেড়ে তার অনুসরণ করলুম মাত্র।

দু'পা না যেতেই 'বোকরা' জঙ্গল আরম্ভ হ'ল। বোকরা 'পাসের' মতই এক রকম ছোট ছোট গাছ। সুন্দর বনের বাঘ নাকি এই বোকরা জঙ্গলই সব হ'তে বেশী পছন্দ করে। 'রমা' কিছু দূর গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ইঙ্গিতে আমাদের ডেকে কাঁচা

মাটির উপর বাঘের মস্ত মস্ত থাবা দেখিয়ে বল্লে 'বাঘটা এই দিকেই আছে, ফিরেনি, ফিরলে সে দাগও থাকতো, ফিরবার এই একটা বই অন্য পথও নেই'। বাঘের শুধু থাবার দাগ দেখেই মনের যা অবস্থা হ'ল সে ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রতি পায়ে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাঘটা লাফ দিয়ে আমাদেরই কারুর ঘাড়ে পড়লো।

সেই একমাত্র 'সুড়ি' পথ ধরে চলেছি, আগুপাছু হয়ে। অতি সঙ্কীর্ণ এই জঙ্গলের মাঝের পথ যা বন্য জন্তুগুলো যাওয়া আসা করে তাদের গা ঘোষে তৈরী হয়েছে তাকেই তারা 'সুড়ি' পথ বলে। সেই পথের উপর হরিণের পায়ের দাগ, বরার পায়ের চিহ্ন, বাঘের থাবা সবই স্পষ্ট পড়ে আছে। তাদেরই একটা হয়ে এই সন্ধ্যায় আমরা সেই

পথে চলেছি, গভীর এই কালা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। ফিরে পালাবার জন্য মন কি করছিল, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। জঙ্গল পার হ'তেই হবে নইলে নৌকা পাবার উপায় কি? নিঃশব্দে বন্দুকটা বুকের সঙ্গে এক করে ধরে চলেছি। 'রমা' আবার থমকে দাঁড়ালো। সামনে চাইতেই দেখি প্রকাণ্ড একটা বরা মস্ত মস্ত তার দাঁত নিয়ে, আমাদের দিকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। আমরা সবাই নিজের নিজের বন্দুক ঠিক করে তখন দাঁড়িয়েছি কিন্তু কারুর সাহস হচ্ছে না গুলি করতে। জানি আহত বরা আমাদের দু' একজনকে সঙ্গে না নিয়ে যাবে না, আবার বাঘটাও এই কাছেই কোথাও এখনও ঘুমুচ্ছে। একবার তার ঘুম ভাঙ্গলে বিদ্রোহী আমাদের কি আর সহজে নিস্তার আছে! আর

বন্দুকের শব্দ শুনলে সে রাত্রির মত হরিণ কি সে বনের বাইরে চরতে বেরুবে ! এই সব ভেবে 'রমা' তাকে চোখে চোখে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো মাত্র। আমরা তার সাহসের উপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে রইলুন। তেমনি ভাবে ৫ মিনিট কেটে গেল। বরা যখন এগুতে সাহস করলো না আমাদের দল দেখে, তখন 'রমা' একবার শিষ দিল। শিষের শব্দ শুনেই বরা হঠাৎ এমনি ভয় পেলে যে, আর মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা না করে মুখ ফিরিয়ে দৌড় দিল। সানতালেরা নাকি বরা শিকারের সময় এমনি করে শিষ দিয়ে বরার প্রতি তাদের কুকুর লেলিয়ে দেয়। উপস্থিত বিপদের হাত হ'তে রক্ষা পেলুম। আবার সেই পথ ধরে চারিদিকে চাইতে চাইতে চলেছি।

তখন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে যখন আমরা শিকারপুর জঙ্গলের পূর্ব্বপ্রান্তে একটা খোলা 'হরিণ-চরার' ধারে এসে দাঁড়ালুম। সেখানেও সেই বাঘের খাবার চিহ্ন, হরিণের পায়ের দাগের ছড়াছড়ি। জঙ্গলের মাঝে এমনি স্থানে স্থানে খোলা মাঠ আছে, হরিণগুলো সেইখানে কচি ঘাস খেতে, খেলতে সাঁঝে সকালে এসে থাকে। এইজন্য লোকে এদের 'হরিণ-চরা' বলে থাকে। এই হরিণ-চরার আশে পাশের জঙ্গলে বাঘ ওৎ পেতে বসে থাকে। হরিণের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রখর, বাঘের গায়ের গন্ধ পেলে হরিণ আর সেখানে থাকে না। তাই বাঘও এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। সে বায়ুর বিপরীত দিকে বসে। তারা বলে থাকে বাঘ বায়ু উঁচু করে বসে। হরিণ

৬

চরতে চরতে যখন আপনা ভুলে বাঘের কাছাকাছি এসে পড়ে বাঘ তখন তার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ে। এই হরিণ-চরার ধারে বাঘও যেমন এসে হরিণের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, তেমনি আমাদের মত শিকারীরাও এসে আত্ম-গোপন করে থাকে। শিকারীরা আত্ম-গোপনের জন্য দ্বিবিধ উপায় সাধারণতঃ অবলম্বন করে। কেউ হয়ত সুউচ্চ এক বা ততোধিক মাচা বেঁধে বসে থাকে, কেউবা মাটিতে খাল কেটে তারই ভিতর লুকিয়ে থাকে। অবশ্য খাল কেটে লুকিয়ে থাকা অল্পায়াশ সাধ্য কিন্তু ইহাতে জীবনের ভয় বড় বেশী। শিকারী সুবিধা বুঝে গুলি করে, কিন্তু তখন তখন আহত হরিণ ধরতে যায় না। একটু অপেক্ষা করে। কাছে বাঘ থাকলে অবশ্যই বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বের হবে।

হরিণ নিয়ে পালাবে, যদি শিকারী তাকেও না সেই সঙ্গে গুলি করতে পারে। কিন্তু বাঘ এমনি শীঘ্র এসে শীঘ্র পালায় যে শিকারী তাকে গুলি করবার অবসরই পায় না।

আমরা যেখানটায় এসেছি তার তিনদিকে কালা জঙ্গল আর একদিকে অকূল নদী। আমরা আগে হ'তে মাচা বাঁধবার কোন বন্দোবস্তই করিনি, এখন আর সে সময়ও নেই, কাজেই তাড়াতাড়ি গোটা দুই গর্ত্ত ঠিক করে নিতে হবে। জঙ্গলের দিকে বসতে কিন্তু কেউ রাজি হ'ল না, বাঘের সেই থাবাগুলোর দিকে চোখ পড়াতে। সবারই বিশ্বাস বাঘ এই আসে পাশেই ওৎ পেতে আছে। হরিণ না পেলে আজ আমাদেরই একজনকে দিয়ে তার ক্ষুধার তৃপ্তি করবে। 'রমা' চটপট একটা খাল ঠিক করে, তার

ভিতর আমাদের তিনজনকে দুটো বন্দুক দিয়ে বসিয়ে; কি কতকগুলো পাতা ঢেকে দিয়ে গেল। নিজে জঙ্গলের একবারে ভিতরে না হ'লেও, অতি নিকটে গিয়ে একটা স্থান করে নিল। আর যাবার সময় বলে গেল 'সব দিকে চোখ রেখো, জলের দিকটাও বাদ দিও না, সেদিক হ'তে যেন কুমীরে টেনে নিয়ে না যায়'।

চুপটী করে বসে আছি. আর ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাচ্ছি। মাথা কিন্তু উঁচু করতে মোটেই সাহস হচ্ছে না। তেমনি অবস্থায় এক ঘণ্টারও উপর কেটে গেছে কিন্তু কিছুই এলো না। আর বসা যায় না। বাঘ এলো না, হরিণ এলো না, কিন্তু রাজ্যের মশার পাল এসে আমাদের ছেয়ে ফেল্লে। তা'রা এমন ভীষণ কামড় আরম্ভ করলে যে,

মনে হচ্ছিল, প্রকাণ্ড একটা মৌচাকের সব মাছিগুলোকে কেউ যেন অভিশপ্ত করে আমাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছে। আকাশ বাতাস তা'রাত ছেয়ে ফেলেছিলই, অধিকন্তু মনে হচ্ছিল যেন মাটি ভেদ করেও উঠছে তারা। বিপদের উপর বিপদ করেছি মনে হচ্ছিল মেদনীপুরের সেই ছেলেটাকে আমাদের গর্ত্তে নিয়ে। তাকে যত বলি 'একটু চুপ কর' সে ততই হাঁসে। জানিনা মশার কামড়ে এমনতর বিদ্‌খুটে হাঁসির কি ছিল। আমরা যখন প্রাণের ভয়ে অস্থির, কেবলই ভাবছি বাসা ফিরতে পারলে বাঁচি, আর শিকারে কাজ নেই, সে যে তখন এমন নচ্ছাড়ে হাঁসি হাঁসতে পারে এ কল্পনারও অতীত। যখন দেখলুম তার হাঁসি থামাবার অন্য উপায় নেই, এবং তা' হ'তেই কি সর্ব্বনাশ না সংঘটিত হ'তে

পারে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য হাতের বন্দুকটা নামিয়ে রেখে পকেট হ'তে রুমাল বের করে তার মুখে জোর করে পুরে দিলুম। সে বিনাপত্তিতে একটা প্রকাণ্ড 'রসগোল্লা'র মত সেটা চিবুতে লাগলো। ঠিক সেই সময়ে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম।

চেয়ে দেখি 'রমা'র গর্ত্তের সামনে প্রকাণ্ড একটা 'বরা'। সে একবার তাদের লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে, আরবার দু'পা পিছনে সরে যাচ্ছে। 'রমা' তার বন্দুকটা ধরে বসে আছে মাত্র। আগুপাছু সব ভেবে সে গুলি করতে সাহস করছে না। এমনভাবে বিপদকে জীবনে আর কখনো বরণ করে নেইনি। ভাবতে পারছিলুম না এক মুহূর্ত্ত পরে কি ঘটবে, যদিই 'রমা' গুলি করে বসে। বাঘ ও বরার সঙ্গে একত্র যুদ্ধ আমাদের পক্ষে কখনই

সম্ভব হবে না।" আজ আর বোধ হয় কেউই বাড়ী ফিরবো না। কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে কে যে কখন সাহায্য করে তা' কে অনুমান করতে পারে। যখন 'রমা' ও বরার মাঝে এমনিতর একটা টানাটানি চলছে, সেই সময় জঙ্গলের ভিতর একটা বাঘ যেন অন্য একটা জন্তুর পিছনে তাড়া করছে এমনি একটা শব্দ হ'ল। তাতে যে শুধু আমাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল তা' নয়, বরাটাও ভয় খেয়ে ভীষণ বেগে একটা দৌড় দিল। আমরা হাঁপছেড়ে বাঁচলুম। ভাবতে লাগলুম কতক্ষণে নৌকা এসে পৌঁছাবে, কতক্ষণে সেখান হ'তে পালাতে পারবো। সে কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা! নৌকা আর আসে না।

রাত্রি তখন সাড়ে আটটা যখন হরিণ-চরার উত্তর প্রান্তে এসে ৪টা হরিণ দেখা

দিল। আমরা তখন সব ভুলে কি করে তাদের পাল্লার মধ্যে পাব সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে সৌভাগ্য সেদিন হবার ছিল না। আবার জঙ্গলের ভিতর সেই শব্দ! হরিণগুলো নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। 'রমা' এবার নিতান্ত বিরক্ত হয়ে 'কূ' দিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ শুনতে পেলুম। বুঝলুম নৌকা আমাদের অল্প দূরেই অপেক্ষা করছিল। 'কূ'র অনুসরণ করে নৌকা কাছে এসে লাগতেই সবারই আগে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো সেই ছেলেটা। আর কথাটী না বলে সঙ্গে সঙ্গে তা' হ'তেও লম্বা একটা লাফ দিয়ে নৌকায় পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হবে আঁধারে দূরত্ব সে মোটেই ঠিক করতে পারেনি। ভাগ্যে পাড়াগাঁয়ের

ছেলে সাঁতার জানতো তাই রক্ষে, তা' না হ'লে সে রাত্রে তাকে হারিয়ে আসতে হ'তো। সেদিন দুপুর রাতে যখন বাসায় ফিরলুম তখন সকলের ঠাট্টার চোটে টেকা দায়, শোয়াত দূরের কথা। কেউ বুঝলো না আমাদের জোর ভাগ্য যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি। সকলের মুখেই এক কথা 'আরে ছ্যা! ছ্যা!' 'রমা'কে কিন্তু আর দেখতে পেলুম না।

(২)

সকাল তখন ৮টা। তখনো ঘুমিয়েছিলুম। 'রমা'র ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। সে বড় ব্যস্ত। শিকারে যেতে হবে, সে হরিণের সন্ধান নিয়ে এই ফিরে আসছে। তার মুখ চোখের ভাব দেখে না বলবার সাহসই হ'ল

না। উঠে দেখি গত সন্ধ্যার সব ক'জনেই বসে জটলা করছে, ঘুমিয়েছিলুম কেবল আমিই। আজ আর সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না কিন্তু মুখের সামনে তাকে না বলতেও পারলুম না। প্রায় দু' মাইল গিয়ে 'রমা' ধান ক্ষেতের একদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমাদের দাঁড়াতে বল্লে। কাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে ঠিক করে দিয়ে সে নিজে একটা মোড় আগলে দাঁড়ালো। পিছনে আমাদের জঙ্গল, সামনে আমাদের ধান ক্ষেত। হরিণগুলোকে তাড়া করলেই তারা জঙ্গলের দিকে পালাবার চেষ্টা করবে, আর সেই সময় গুলি করতে হবে।

ইতিমধ্যে একদল রাখাল এসে আমাদের সঙ্গে জুটেছিল। তা'রা ধান ক্ষেতের ভিতর গিয়ে 'হো, হো! হা, হা! হো, হো!' করে

চীৎকার পাড়্‌তেই হরিণগুলো চারিদিকে ছুটাছুটী আরম্ভ করলো। পরিশেষে তা'রা এমনি জোর লাফ দিয়ে একটা বাঁধ পার হ'য়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল যে আমরা শুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম, হাতের বন্দুক হাতে রেখে। 'রমা' কিন্তু আমাদেরই একটা নয়। তার বন্দুকের গুড়ুম শব্দে জঙ্গল কেঁপে উঠলো। আমরা আরও অবাক হ'য়ে ছুটে গেলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম না কাকেও। না আছে 'রমা', না আছে হরিণ, না আছে তার বন্দুক পড়ে, আছে শুধু একস্থানে একডেলা রক্ত, আর পায়ের আঁচড়কাটা দাগ। ভয়ে ত আমাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। আমরা সেই রক্তের পাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে দাগগুলো পরীক্ষা করছি, জঙ্গলের কোন সুদূর প্রদেশ হ'তে তখন 'রমা'র কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে যেন

হ'ল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। যা থাকে অদৃষ্টে বলে সবাই আমরা সেই স্বর লক্ষ্য করে ছুটলুম। শরীর ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে রক্তে টুইল সার্ট ভিজতে লাগলো। কিন্তু 'রমা' কোথায়! এই একস্থানে তার স্বর শুনি, পর মুহূর্ত্তেই মনে হয় যেন সে কতদূরে সরে গেছে। তারপর! তারপর! তার স্বর কোথায় বাতাসে মিলিয়ে গেল। কতস্থানে গাছের পাতায় রক্তের দাগ ধরে তার অনুসরণ করবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। তার ডাক আর একবার শেষবার শুনবার জন্য বৃথা উৎকর্ণ হ'য়ে রইলুম।

বেলা তখন ১১টা। জঙ্গলের বাইরে এসে পরিশ্রান্ত দেহ, আর সন্দেহপিড়ীত মন নিয়ে একটা চাষীর ঘরের দাবায় বসে পড়লুম। বাড়ীই নাই তারা কেউ, একটা ছেলে ছাড়া।

সে বসে বসে চরকা কাটছে, সামনে তার মোটা সুতার একটা তানা টানা রয়েছে। তার মুখের দিকে চেয়ে একটু খাবার জল চাইলুম। সে হাতের সুতা ছাড়িয়ে রেখে ছাই দিয়ে একটা ঘটি মাজতে গেল। সোণার বরণ ঘটি ভরে তার জল এনে দিল। প্রাণ ভরে তাই খেলুম। এক দুই করে সবাই এসে জুটলো, সবাইকে সে জল দিয়ে তুষ্ট করলে। এলো না কেবল 'রমা'। তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে রইলুম। ইচ্ছা হ'ল আবার তাকে খুঁজতে যাই। কিন্তু দেহে সে শক্তি কৈ, মনে সে বল কৈ? জঙ্গলের দিকে তাকাতে ভয় করতে লাগলো। 'রমা'কে হারিয়ে লজ্জায় হেঁট মাথা করে প্রায় ১টার সময় বাসায় ফিরে এলুম। কিন্তু শান্তি কোথায়! বাসায় সকলের প্রশ্নে কাণ ঝালা

পালা হয়ে উঠলো। কি উত্তর দেব খুঁজে কিছু পাই নে। অবসন্ন দেহ ও মন নিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পালঙ্কের উপর পড়ে রইলুম। 'রমা'র কি হ'ল ভাবতেও ভয় করতে লাগলো।

বেলা তখন ৩টা। কার ডাক শুনে চমকে উঠে বসলুম। চোখ মুছে দেখি, সামনে 'রমা' দাঁড়িয়ে। ঝক্ ঝকে তার দাঁতগুলো হাঁসিমাখা হয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো তার জ্বলছে। তার আঁচড় কাটা দেহের ক্ষতমুখ হ'তে স্থানে স্থানে তখনো রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। শুনলুম, একটা হরিণ তার গুলি খেয়ে পড়েছিল, কিন্তু যেমন সে ধরতে যায়, অমনি সে দৌড় দেয়। সেও তার পিছনে ছুটে। চীৎকার করে আমাদের ডেকেছিল। সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু সে

হরিণটাকে দৃষ্টির বার হ'তে দেয় নি আর আমরাও তার কাছে পৌঁছাতে পারিনি। পরিশেষে একটা কালা জঙ্গলের মাঝে হরিণটাকে হারিয়ে ফেলে।

(৩)

সে আজ কত কালের কথা যেদিন সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে কপিল মুনির শাপে ছাই হ'য়ে গেল। সগর বংশ লোপ পায় দেখে ভগীরথ মুনির আশ্রমে ধন্না দিয়ে পড়লেন। কত যুগযুগান্তরের পর জানতে পারলেন গঙ্গাজলে কপিলাশ্রম ধুতে হবে। তা'হলে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে শাপমুক্ত হবে। ভগীরথ ব্রহ্মার বর লাভ করে তাঁর কমণ্ডলু হ'তে শিবের সাহায্যে গঙ্গা নিয়ে স্বর্গ হ'তে মর্ত্তে এলেন, কপিলাশ্রম ধুয়ে

দিলেন। গঙ্গার সব জল আশ্রম ধুয়ে সাগরের সৃষ্টি করলে। এই গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল 'গঙ্গাসাগর' নামে খ্যাত। এখন ইহা হিন্দুর পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। বছর বছর সেখানে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। কত বিভিন্ন স্থান হ'তে লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগমে সাগর-সৈকত ভূমি এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। মনে হয় যেন আবার সগরের ষাট হাজার ছেলে পুত্র পৌত্রাদি সহ ফিরে এসেছে। সগর যেমন একদিন এইস্থানে তাঁর ষাট হাজার ছেলে হারিয়েছিলেন, এখনো তেমনি হিন্দু জননী এইস্থানে পুত্র বিসর্জ্জন দেওয়া এক মহাপুণ্য মনে করে থাকেন। পূর্ব্বে হাজার হাজার মা বছর বছর তাদের আদরের দুলালদের, এই সম্মিলনীর মহোৎসবের দিন, এই গঙ্গাসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, মরণ তাদের

চোখের সামনে দেখে পুণ্য অর্জ্জন করতেন। আজ কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আইন প্রভাবে এই প্রথার রাক্ষসীভাব তিরোহিত হ'লেও ইহা যে সম্যকরূপে রহিত হ'য়েছে একথা বলা যায় না। ভারতের পর্ণ-কুটীরে শিক্ষা-দীপ এখনো জ্বলেনি, রাত্রির আঁধারে আইন আজও যাকে গ্রাস করতে পারে না। তাই এখনো কত ক্ষুদ্র শিশুর নিষ্পাপ শরীর সেখানে ভাসতে দেখা যায়।

'রমা' আজ জেদ ধরেছে গঙ্গাসাগরের ওই দিকটায় শিকারে যাবে। শিকার না পাই বেড়াতে যেতে দোষ কি ভেবে বিনা আপত্তিতেই রাজি হলুম। সকালের ভাটায় নৌকা ছেড়ে পাঁচজন আমরা বেরুলুম। বেলা তখন ১১টা যখন ভাটার প্রচণ্ড টানে নৌকা আমাদের হু হু করে ছুটেছে। সাগরের মুখে

ঢ

এসে পড়েছি। স্রোতের কি সে বেগ! কি সে এক একটা ঢেউ! শব্দে তার কাণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে। এমন প্রলয়ের তুফানের মাঝে কোনদিন পড়িনি। প্রত্যেক ঢেউর সঙ্গে মনে হচ্ছে, ক্ষুদ্র আমাদের তরীখানি এই বুঝি সাগরগর্ভে লীন হ'য়ে গেল। তিনজন মাঝির অক্লান্ত পরিশ্রম ও আমাদের কাতর ডাকই বুঝি তাকে ভাসিয়ে রেখেছিল।

জীবনে এই আমার প্রথম সাগর সন্দর্শন। কূলে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছি। ঢেউ 'পরে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে। আকাশ তাকে বুক বেড়ে ধরেছে। বাতাস তাদের স্পর্শ নিয়ে কেঁপে কেঁপে আসছে। সূর্য্য তার হিল্লোলে নাচছে। গগনভেদী কোলাহল তাদের বুকের উচ্ছ্বাস দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিথিল দেহে, অবশ মনে

প্রস্তর-কপিলের পায়ের কাছে, ভগীরথের একপাশে বসে পড়লুম। আজ প্রস্তরমূর্ত্তির সামনে বসেও মনে হচ্ছিল, প্রকৃতই কোন পুণ্যতীর্থে এসেছি। আজ ত্রেতা ও দ্বাপরের কত কথা, পুরাণের কত স্মৃতি প্রাণে আমার জেগে উঠছিল। রশি দুই দূরে একদল সন্ন্যাসী বাস করছেন। সভ্যজগতের বাইরে, বনের হিংস্র জন্তুদের মাঝে, তাঁরা যে ভাবে আশ্রমের কাজ করে আসছেন, সে সত্যযুগের ছায়া কি স্বপ্ন বলে মনে হয়। আমি ঠিক করতে পারছিলুম না কে আমি, কোথায় আমি, কোন কালের আমি এই অনন্তের দুয়ারে অর্ঘ্য আমার নিয়ে সকলই ভুলে একটী ছবির দিকে চেয়ে আছি। কে এমন নীল আকাশ এঁকেছে, তার নীচে কে এমন তরঙ্গায়িত সাগর এঁকেছে, ওই অনন্তের কোলে কে এমন করে ক্ষুদ্র

পিয়াসা

তরীখানি সাদাপালে উড়িয়ে দিয়েছে, ওই ভাগীরথী-বুকে কে অমন স্বর্গের সুষমা ছড়িয়েছে, আর তার পাশে ওই তপোবন—শত শত সন্ন্যাসীর আশ্রম-কুটীর কে এঁকেছে, তা'রি মাঝে ওই মরূদ্যান—সাগরসৈকতে ফুল ফল শোভিত ক্ষুদ্র মিষ্টি জলের পুকুরটী কার তুলিকার স্পর্শ পেয়ে অমন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, ওই চারিদিকে হরিণ, ব্যাঘ্র, বরা ও হাজার হাজার পাখীর এমন একত্র সমন্বয়ে কে রঙ মাখিয়েছে? এই কি সেই কপালকুণ্ডলার কাপালিকের সাধনাভূমি? ওইত তেমনি বালিয়াড়ি উন্নত তার শৃঙ্গরাজি নিয়ে কত যুগযুগান্তরের কথা প্রচার করছে। ওগো চিত্রকর! দেবতা আমার! একটীবার বল আর কোথাও এমন ছবি এঁকেছ কি না, মর্ত্তে স্বর্গ আর কোথাও সাজিয়েছ কি না! এই

মহান আলেক্ষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে কার না মনের হিংস্রভাব, পাশব বৃত্তিনিচয় আপনা হ'তেই সরে যায়! কার না হাতের বন্দুক খসে পড়ে!

তারপর ক' ঘণ্টা সাগরোপকূলে শুধু উপলখণ্ড কুড়িয়ে কাটিয়েছি। 'রমা' কিন্তু বালিয়াড়ির মাথায় মাথায় কাপালিকের তাণ্ডব নৃত্য করে ফিরেছে। কখনো সে লাফ দিয়ে এসে সাগরের জলে পড়ে, কখনো ছুটে গিয়ে বনানীর মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। সূর্য্য তখন ডুবু ডুবু যখন সে এক আঁচল রঙ বেরঙের ঝিনুক এনে আমার পায়ের কাছে ফেলে বল্লে 'এই নিন'। সে গুলোর উপর রঙের খেলা দেখে অবাক হ'য়ে 'রমা'র দান গ্রহণ করলুম।

সেদিন সন্ধ্যার আঁধারে নদীতে যখন জোয়ার লাগলো তখন আমরা কপিলাশ্রম

ছেড়ে নৌকায় গিয়ে উঠলুম। প্রায় ১০ মাইল বেয়ে যেখানে 'সাতবাঁকী,' 'কীর্ত্তনখালি' ও 'প্যাগোডা' তিন বোন তা'রা মিশেছে, সেই স্থানে 'মগরা'র নীচে নৌকা আমাদের বাঁধলো। এই নাকি সেই বঙ্গ কবির শ্রীমন্তের মগরা। এইস্থানেই নাকি সওদাগর তাঁর বোঝাই জাহাজ নিয়ে যেতে পদ্মবনে দেবীমূর্ত্তি দেখেছিলেন। এইস্থানেই নাকি বধ্য ভূমিতে আনীত শ্রীমন্ত দেবীরূপী মাকে তাঁর কাতর প্রাণে ডেকেছিলেন। 'কমলে-কামিনী' কোন সুদূর অতীতের স্মৃতি হ'লেও, মগরা এখনো তার অতীত কাহিনী ভুলেনি।

(৪)

আজ সকাল হ'তেই বৃষ্টি পড়ছিল। তবু তা'রি মাঝে 'রামকরে'র চরে হরিণ মারতে

এসেছি। ট্যাভারল্যাণ্ড জঙ্গল পার হ'য়ে, রামকরের যেখানটায় কালা জঙ্গল কাটতে সবে হাত দিয়েছে সেইখানে বেলা প্রায় ৫টায় ক্ষুদ্র একটা নদীর ধারে নৌকা আমাদের বাঁধলো। আমরা পাঁচ কি ছয়জন তখন তখন নৌকা হ'তে লাফ দিয়ে পড়ে তীরে এসে দাঁড়ালুম। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একশ' হাত চওড়া একটা রাস্তা এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেটে চলে গেছে। আমরা সেই 'সলুই' ধরে, প্রায় দু'মাইল হেঁটে, জঙ্গলের অপর প্রান্তে এসে পোঁছালুম। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়েছে। বৃষ্টি আবার তাতে জোরে পড়তে লাগলো। জঙ্গলের মাথায় সেখানে বেড়ার একটী ছোট কুটীর ছিল। কুলিরা, শুধু কুলিরা কেন, বনের বাঘ, বরা, এমন কি হরিণগুলো পর্য্যন্ত তা'রি ভিতর বৃষ্টি বাদলে

আশ্রয় নিত। একদিন তা'রি ভিতর প্রকাণ্ড একটা বাঘ মারা পড়েছিল। আমরাও এসে আজ তা'রি ভিতর মাথা গুঁজে বসলুম। কিন্তু যখন বৃষ্টি থামবার আর কোন চিহ্নই দেখলুম না, তখন শিকারের সাধ ত্যাগ করে নৌকায় ফিরাই সকলের মত হ'ল।

আগুপাছু হয়ে আমরা সব কজনেই বেরিয়েছি। তবে তা'রি মাঝে একজন তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরবার জন্য আমাদের একটু আগে আগেই যাচ্ছিল। তখন আমরা এক মাইলও নৌকার দিকে আসিনি, যখন আমাদের পায়ের নীচে মাটি একটা গভীর গর্জ্জনে কেঁপে উঠলো, আর কেঁপে উঠলো তা' হ'তেও অধিক জোরে আমাদের প্রাণগুলো। আমাদের শিরায় শোণিত-প্রবাহ তখন যেন বন্ধ হয়ে আসছে, আমরা

পরস্পরকে ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। সামনে চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা ডোরাদার বাঘ, দাঁত বের করে, তার গভীর গর্জ্জনে বনভূমি প্রকম্পিত করছে। চোখ দুটো তার জ্বলছে, জিহ্বা তার লক্ লক্ করছে, লেজটা সে এপাশ ওপাশ নাড়ছে। সামনের বেচারা গতিশক্তিহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। এক সেকেণ্ড সময়ও তখন ভাববার নেই, নষ্ট করবার নেই। উদ্ধার কোন পথে!

বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখি 'রমা' সবারই সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে তার একগাছা মাত্র বংশদণ্ড, দাঁত, মুখ, চোখে অদ্ভুত একটা পৈশাচিক ভাব। গলার চীৎকারে সে সুন্দরবনের ডোরাদারকে হার মানিয়েছে।

তার প্রত্যেক গর্জ্জনটার সঙ্গে সঙ্গে সে এমনি প্রতিগর্জ্জন দিচ্ছে যে, আমাদের মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হ'ল না কি করতে হবে ঠিক করতে। সবাই আমরা 'রমা'র সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রতিগর্জ্জনে তা'র যোগ দিলুম। বনেররাজা কি করতে হবে তখন তখন ঠিক করতে না পেরে, পথ ছেড়ে দু' একটা গাছের আড়ালে সরে গিয়ে, আমাদের অনুসরণ করতে লাগলো। সে তেমনি ভাবে গর্জ্জন করতে করতে চলেছে, আর আমরা তার অনুকরণ করে একটু ক্ষিপ্র গতিতে চলেছি মাত্র। ঠিক বলতে পারি না সেই আমাদের সঙ্গে পা সমান রেখে চলেছিল, না আমরা তার সঙ্গে। সে পথ যেন আর শেষ হয় না, সেও আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না। এমনি করে আমরা যখন জঙ্গলের শেষপ্রান্তে এসে পড়লুম, আর নৌকার মাঝিরাও বের

হয়ে আমাদের চীৎকারে যোগ দিল, তখন বনের রাজা একটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে গেল। তার সে গর্জ্জনে জল, স্থল, আকাশ, বাতাস সব যেন কেঁপে উঠলো।

প্রাণের প্রতি এতখানি মমতা কোন দিন বোধ করি নি। কোন মতেই মনকে এমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে পারছিলুম না। যখন নৌকায় এসে উঠলুম তখন সমস্ত গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। মুখে কারো কথা নেই, 'নৌকা ছাড়' বলেই বসে পড়লুম। বিরক্তি বোধ হচ্ছিল তখনো 'রমা'কে তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তবু তার প্রতি চাইতে চোখ আমার জলভরা হয়ে উঠলো।

কিছু দূর নৌকা ছেড়ে না যেতেই ঝড় ও বৃষ্টি ভীষণ হয়ে দেখা দিল। সব যেন

ভেঙ্গেচুরে একটা নূতন কিছু গড়বার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। উন্মত্ত নদীবুকে ক্ষুদ্র আমাদের নৌকাখানির তখনকার অবস্থা ভাবতে আজও প্রাণ শিউরে উঠে। ভয় হচ্ছিল, একটা বাঘে বুঝি আমাদের সব ক'জনকে গ্রাস করতে পারত না বলে, এ ডুবিয়ে মারবার ব্যবস্থা, এ হাঙ্গর কুমীরের মুখে ফেলে দিবার ব্যবস্থা, কেউ নূতন করে যেন করে গেল। যখন আমরা কাতর প্রাণে তাঁর দুয়ারে সাহায্য ভিক্ষা করছি, তখন এ কি কঠিন পরীক্ষা! কে যেন কাণে কাণে বলে গেল 'তেমনিটী কর, যেমনটী পেতে চাও'।

বনানীর বুক ভেদ করে কার কাতর ক্রন্দন, কোন্ বালক 'কণ্ঠের এ করুণ স্বর ভেসে আসছে? চোখের নিমেষে দেখলুম 'রমা' দাঁড়

ধরেছে। তুফান মাথায় করে সে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়ে চলেছে। নদীর একটা বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে, ক্ষুদ্র একটা খোলা নৌকায় দেখি, বিভিন্ন বয়সের পাঁচজন তা'রা, প্রবল বৃষ্টির ঘা খেয়ে কাতর হয়ে পড়েছে। সব চেয়ে ছোটটী তাদের আকুল নয়নে কাঁদছে। তা'রা প্রাণের আশা ছেড়ে, যখন বাঘ ও বরার কাছে, বনের ভিতর আশ্রয় ভিক্ষা করতে যাচ্ছিল, তখন 'রমার' গলার স্বরে তা'রা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কোন কথা বলবার আগেই সে এক এক করে তাদের সবগুলোকে আমাদের নৌকায় তুলে নিয়ে আগুনটা উসকে দিল। সে কালরাত্রি দুর্ব্বল তা'রা, দরিদ্র তা'রা, ক্ষুদ্র তা'রা আমাদের বুকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে কাটালো।

পিয়াসা

সুন্দরবনে শিকারের সাধ মিটে গেছে। 'রমা' জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে এনে নৌকায় দিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আজ মনসাদ্বীপ ছেড়ে আসবার সময়, কি বলে আসবো তা'কে, কি দিয়ে আসবো তা'কে, তা ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। কোন কথাটী না বলে, আংটীটা আমার খুলে, তা'র আঙুলে পরিয়ে দিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠলুম। পা'ল তুলে দিয়ে নৌকা ভেসে চল্লো। একবারমাত্র চেয়ে দেখেছিলুম—'রমা' তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২২

সম্পূর্ণ